প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন

আয়শা আক্তার

Dhaka University Library
400840
400840
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- ২০০২

M.Phil.

GIFT

400840

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

400840

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষকের নাম
আয়শা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নং- ১৯০
সেশন- ১৯৯৬/১৯৯৭
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, "প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশ গ্রহন" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্নরূপে আমার নিজস্ব গবেষনা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষনা করেননি। এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

ঢাকা
তারিখ ২৮-০২-০২

আয়শা আক্তার
এম. ফিল গবেষক

400840

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য আয়শা আক্তার রচিত "প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ টি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে রচিত একটি মৌলিক গবেষনা। লেখক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

N. Mahtab

তারিখ : 28. 12. 02

মিসেস নাজমুন্নেসা মাহতাব
অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কাজের জন্য যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি আমর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব এর সুযোগ্য তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। তার মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। তার কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

গবেষণা কাজের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিবেদন থেকেও এই গবেষণার উপাদান নেয়া হয়েছে। এই গবেষণার কাজের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ইউনিসেফ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগীতা করেছে। এজন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া ঝিনাইদহ জেলার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিশেষভাবে আমার মেঝ বোন মিসেস ফাতেমা বেগম আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নানা ব্যস্ততার মাঝেও আমার স্বামী মোঃ সাজিদুল ইসলাম এ গবেষনা সমাপ্ত করার ব্যাপারে আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আয়শা আক্তার

তারিখঃ
২৮ ডিসেম্বর, ২০০২ইং

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

জীব-জগতের অন্যতম প্রধান দাবী 'আমি বেঁচে থাকতে চাই'। এই বেঁচে থাকার অধিকারকে রক্ষণ ও পোষন করার জন্য গড়ে উঠেছে সমাজ, আর্বিভূত হয়েছে ধর্ম এবং সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্র। সুতরাং সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সর্ব প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার পথকে সুগম করা। আধুনিক জগতে এই বেঁচে থাকার পথকে সুগম করার জন্য অত্যাবশ্যক সুসংহত শিক্ষা।

শিক্ষা মানব সভ্যতার ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণ করেছে। অর্থাৎ শিক্ষা একটি লক্ষ্য মুখী মানবীয় প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত তার পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধার করতে হচ্ছে এবং এর ফলে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সে নবতর জ্ঞান, দক্ষতা ও জীবন দৃষ্টি অর্জন করেছে। কাজেই শিক্ষার সবচেয়ে বড় আদর্শ হলো মানব ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলা এবং বাস্তবে তার রূপায়ণ।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষা বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ শিক্ষা সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন। যেমন প্লেটো তিন ধরণের শিক্ষাক্রম ও স্কুলের কথা বলেছেন। রুশো প্রকৃতিবাদী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পেস্তালজি বলেছেন মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষার কথা। হর্কিট শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উত্থাপন করেছেন তার পঞ্চ সোপান পদ্ধতি। একইভাবে ফ্রয়েবেল মন্টেসরী, জন ডিউই, হোয়াইড হেড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষী শিক্ষা সম্পর্কে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব দর্শন, মতামত ও মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন যেগুলির মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন দিককে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারি।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন স্বপ্ন। আজ সকলেই জানে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তির অর্থ কেবল বর্ণ চেনা, বর্ণ মিলিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে নিজের নাম স্বাক্ষর নয়, সামগ্রিক উন্নয়ন চেতনার এ হচ্ছে ভিত্তি ও উৎস। পরাধীনতা, শোষণ, বঞ্চনা ও অজ্ঞতার অতীত অতিক্রম করে জাতীয় মেধার অবাধ বিকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুধাবন, ধারণ ও উন্নয়ন এবং নতুন বিশ্ব মানবিক সম্পর্কের চেতনা উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতে আর্ন্তজাতিক ঐক্যভূমি নির্মাণই আজ 'সকলের জন্য শিক্ষা'- এ উচ্চারণের লক্ষ্য।

যে কোন দেশের উন্নয়নে মানব সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। অপরদিকে শিক্ষাই মানব সম্পদ সৃষ্টির একমাত্র হাতিয়ার। এছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্ব শর্ত শিক্ষা। আর সকল শিক্ষার বুনিয়াদ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সকল নাগরিকের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবন-যাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন। যাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর গৃহীত ও প্রচারিত মানব অধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষনায় বলা হয় যে, "শিক্ষা লাভের অধিকার অন্ত তঃপক্ষে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার সকলের আছে"

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র শৈশবকালীন পরিচর্যা ও শিক্ষার স্থল। আবার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার অনুকূল না হলেও হত বিধ্বস্থ পরিবার সহ প্রায় সকলেই শিশু শিক্ষার প্রতি অনুরাগী, যা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম একটি মূলধন। আমার এই গবেষনায় প্রাথমিক শিক্ষার সকল দিক আলোচিত হয়নি, কেবলমাত্র 'প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশ গ্রহণ' এই আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশু সম্পর্কে মৌলিক তথ্যাদি তুলে ধরে তার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোর বিশ্লেষনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষনা প্রতিবেদনে মোট ৭টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথমটিতে গবেষণার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, গবেষণা পদ্ধতি অনুসরন করে যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষনের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করন ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ধারা আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তীতে শিক্ষা উন্নয়নে গঠিত কমিশন গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা- বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। এদেশের শিক্ষা কাঠামো, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, গুরুত্ব, জাতীয় অঙ্গীকার এবং আন্ত র্জাতিক স্বীকৃতি ও কর্মসূচীগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীন যাবতীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বরাদ্দকৃত বাজেট ও গৃহীত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার মূল বিষয় মেয়ে শিশু ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মেয়ে শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থাব সমস্যা ও অন্তরায় সমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ গুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন শিরোনামে ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, পরিদর্শিত বিদ্যালয় গুলোর সামগ্রিক তথ্য বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সবশেষে সপ্তম অধ্যায়ে সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অবস্থান সম্পর্কে ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। শব্দ সংক্ষেপ ও গ্রন্থ পঞ্জীর তালিকা সংযোজিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

মূখবন্ধ		**পৃষ্ঠা**
অধ্যায়- ১ ঃ	**গবেষণা বর্ণনা -**	১-২
১.১.	গবেষণার উদ্দেশ্য	২
১.২.	গবেষণার পদ্ধতি	৩
১.৩.	কর্মপরিকল্পনা	৩-৪
অধ্যায়- ২ ঃ	**বাংলাদেশ- সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**	৫
২.	**বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবর্তন**	৬-৭
২.১.	নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ধারা	৮
২.১.১	প্রাচীন যুগ	৮-৯
২.১.২.	বৈদিক যুগ	৯-১০
২.১.৩.	বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা	১০-১১
২.১.৪.	মুসলিম যুগ	১২-১৩
২.১.৫.	বৃটিশ যুগ	১৪-২৪
২.১.৬.	পাকিস্তান যুগ	২৪-৩১
২.১.৭.	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ শিক্ষায় নবযাত্রা	৩১-৩৮
অধ্যায়- ৩ ঃ	**বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাঃ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত**	৩৯
৩.১	বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো	৩৯-৪১
৩.২	প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪২
৩.৩	প্রাথমিক শিক্ষাঃ শিশু জন্মগত অধিকার	৪৩
৩.৪	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব	৪৪-৪৫
৩.৫.	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী	৪৬
৩.৬	প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় অঙ্গীকার ও সাংবিধানিক অধিকার	৪৭-৪৮
৩.৭	প্রাথমিক শিক্ষাঃ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও কর্মসূচী	৪৯-৫৪
অধ্যায়- ৪ ঃ	**বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা**	
৪.১.	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন	৫৫-৫৬
৪.২.	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম	৫৭-৫৮
৪.৩.	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতি	৫৯
৪.৪	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৬০
৪.৫	সবার জন্য শিক্ষাঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	৬১-৬৬
৪.৬.	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে গৃহীত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহ	৬৭-৭৫
৪.৭.	প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত বাজেট	৭৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৫ ঃ	**মেয়ে শিশু ও প্রাথমিক শিক্ষা- বর্তমান প্রেক্ষাপট**	
৫.১.	মেয়ে শিশুর অধিকার এবং আমাদের দায়িত্ব	৭৭
৫.২	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মেয়ে শিশু	৭৮-৭৯
৫.৩.	বাংলাদেশে মেয়ে শিশু- জন্ম ও শ্রম সংক্রান্ত তথ্য	৭৯-৮০
৫.৪.	শিক্ষা ও মেয়ে শিশু	৮০-৮৯
৫.৫	মেয়ে শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমানে আর্থ-সামাজিক সমস্যা জনিত সমস্যা সমূহ	৯০-৯১
৫.৬	মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ	৯২-৯৩
৫.৭.	সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করনে বর্তমান বাধাসমূহ	৯৩
৫.৮.	প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়	৯৪
৫.৯.	প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ	
৫.৯.১.	রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ	৯৫-১০৫
অধ্যায়- ৬ ঃ	**মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন**	১০৬-১০৭
৬.১.	ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	১০৮-১১৫
৬.২.	ঝিনাইদহ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায় বা বাধাসমূহ	১১৬-১১৭
৬.৩.	সুপারিশ সমূহ	১১৮-১১৯
অধ্যায়- ৭ ঃ	**উপসংহার**	১২০-১২১
	শব্দ সংক্ষেপ	১২২
	গ্রন্থপঞ্জি	১২৩-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

১. গবেষণা বর্ণনা-

"বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানব মাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে, তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া যে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না" - বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালিন সমাজে নারীদের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে নারীরা যে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তা তুলে ধরেছেন। নারীরা যুগ যুগ ধরে সমাজে নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, নিগৃহীত হয়েছেন, ভুকরে কেঁদে মরেছে মানবতা, শৃঙ্খলিত হয়েছে তাদের অধিকার। আজ বিংশ শতাব্দীতে এসে নানা উন্নয়নের পাশাপাশি নারী উন্নয়ের কথা ও ব্যাপক ভাবে আলোচিত হচ্ছে। আর নারীদের কথা উঠলেই সর্বাগ্রে উঠে আসে মেয়ে শিশুদের কথা। আজকের মেয়ে শিশুই আগামী দিনের মা। আর একজন শিক্ষিত মেয়ে পরিবারকে সুন্দর, সচ্ছল এবং পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং একজন পুরুষের মতই গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিতে সক্ষম। আজকের পৃথিবীর মানুষ অতীতের তুলনায় নানা ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে। এই অগ্রগামী হবার সাথে সাথে মানুষ শিশুদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। একটা জাতিকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে সে জাতির শিশুদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহন করা, তাকে অগ্রাধিকার দেয়া, তার বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া অত্যাবশ্যক। এর কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান প্রতিযোগিতাময় যুগে কোন পেশায় পেশাভিত্তিক উন্নয়ন ক্রমাগতভাবে পর্যবেক্ষন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কাজ। গবেষনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সমস্ত কর্মকান্ডের উন্নতি, অগ্রগতি, সবল, দুর্বল দিক চিহ্নিত করা ইত্যাদি কাজ গুলো হয়ে থাকে। পরিকল্পিত, ধারাবাহিক ভাবে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সেই তথ্যের বিশ্লেষন এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে যখন কোন সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় তখন সেই পদ্ধতিতে গবেষনা বলা হয়। তাই বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষনা কাজ করছেন। শিক্ষা পর্যায়ের বিভিন্ন দিক, শিক্ষাক্রম, শিক্ষন-শিখন সামগ্রী প্রনয়ন ও ব্যবহার, পাঠ্যপুস্তক এর বিভিন্ন দিক শিক্ষন-শিখন পদ্ধতি, শিক্ষা মূল্যায়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন অংশসমূহের অসঙ্গতি দুর্বলতা ইত্যাদি দিক অবলম্বনে শিক্ষাগবেষনা কাজ পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা আজকের দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বে অনস্বীকার্য।

সংবিধান হচ্ছে একটি জাতির স্থায়ী দলিল। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে "দেশে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা" থাকবে, "সব ছেলে মেয়ের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা নেয়া হবে আর এই শিক্ষা হবে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ন।" এ সব লক্ষ্য থেকে আমরা এখনও সরে আসেনি। তবে এ লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে কি কি করা দরকার, কোন পথে গেলে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তাও স্থির করতে হবে। আমাদের এ ব্যাপারে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে- নিতে হবে জরুরী ভিত্তিতে কর্মসূচী।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ১৪ কোটি শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষা হতে বঞ্চিত। যাদের দুই তৃতীয়াংশই মেয়ে শিশু। বিদ্যালয়ের মেয়েদের উপস্থিতির হার এখনও কম। তাই এই গবেষণায় প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাতে আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহন সম্পর্কে মৌলিক তথ্যাদি তুলে ধরে তার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো বিশ্লেষনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

মানবিক সম্পদ গড়ে তোলার মূল ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষা। শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভ একটি মৌলিক অধিকার। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা পুরোপুরি ভাবে এখনও সম্ভব হয়নি। কুসংস্কার ও নানা সামাজিক কারনে মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ চলছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। অথচ পারিবারিক কুপ্রথা ও অজ্ঞতা দূর করে শিশুর বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে মেয়েদের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। দরিদ্র দেশের দরিদ্র সমাজে জন্ম নিয়ে একটি মেয়ে শিশু যে নিগ্রহ ও বঞ্চনার শিকার হয় তা বনর্ণাতীত। মেয়ে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার নির্ণয়, বৃদ্ধি করা এবং তাদের মৌলিক সমস্যাদিও তা নিরসনের উপায়- এই গবেষনার উদ্দেশ্য।

গবেষনার উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থার আলোকে মেয়ে শিশুদের অবস্থান নির্ণয়।
- পশ্চাতপদ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে মেয়েদের সমাজে যথাযথ মর্যাদা প্রদান।
- নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ধারা আলোচনা ।
- শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠন প্রচেষ্টায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহনকে স্বীকৃতি দেয়া।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করন।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অতীত ও বর্তমানে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বিশ্লেষন পূর্বক উন্নয়নের ক্ষেত্র গুলো চিহ্নিত করন।
- মেয়ে শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আর্থ-সামাজিক সমস্যা গুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষন।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য চিহ্নিত করন।
- লিঙ্গীয় সাম্য অর্জনের মাধ্যমে মেয়ে শিশুর সুষম প্রাথমিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করন।
- মেয়ে শিশুদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূর করা।
- পিতা মাতাদের মেয়েদের প্রতি যত্নবান হয়ে তাদের স্বশিক্ষা ও সম অধিকার নিশ্চিত করনের অঙ্গিকারাবদ্ধ করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করনের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের মেয়েদের ঝরে পড়ার হার রোধকল্পে কার্যকর। ব্যবস্থা গ্রহনে আলোকপাত করা।
- সবশেষে এই গবেষনায় ভবিষ্যতে মেয়ে শিশুদের অংশ গ্রহন বৃদ্ধিকল্পে সুপারিশমালার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩. গবেষণা পদ্ধতিঃ

গবেষনা কার্য পরিচালনা করার জন্য প্রধানত জরিপ পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক ও সেকেন্ডার উপাদ্তের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষনার বিষয়কে চিন্তা করেই এর প্রশ্নমালা সাজানো হয়েছে যাতে করে প্রাপ্ত তথ্যাদি আমার গবেষনা কর্মের সহায়ক হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিসে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, শিক্ষকদের প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহন করি। জেলা পর্যায়, উপজেলা পর্যায় এবং বিদ্যালয় পর্যায় থেকে নির্ধারিত ছকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফাইল ও রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেকেন্ডারী পদ্ধতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উপর পূর্বে যে গবেষনা সম্পন্ন হয়েছে যে সব উৎস থেকে, নারী উন্নয়নে লিখিত ডকুমেন্টস, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন জার্নাল, বই, সরকারী নথিপত্র এবং দৈনিক পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সবশেষে উপাত্ত বিশ্লেষন করে যাবতীয় তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.৪. কর্মপরিকল্পনা ঃ

"প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন" শীর্ষক গবেষনাটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষন ও তথ্য সংগ্রহ এবং উপাত্ত সংশ্লেষন ও সুপারিশের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় তথ্য গ্রহন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস, পরিদর্শন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের বর্তমান অবস্থান জানার জন্য জরিপ পরিচালনার নিমিত্তে বিভিন্ন প্রকারে ছক এবং সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়-

১। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
২। উপজেলা শিক্ষা অফিসার
৩। সহকারী মনিটরিং অফিসার
৪। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা
৭। অভিভাবক বৃন্দ
৮। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং
৯। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

Dhaka University Institutional Repository

এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান, শিক্ষার্থীদের অবস্থান, অবকাঠামোগত অবস্থা, শিক্ষার্থীদের মোট ভর্তির হার, নীট ভর্তির হার, ঝরে পড়ার হার, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী মেয়ে শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঝিনাইদহ জেলায় ২০০০ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের সাথে যৌথভাবে আবার কখনো একা বিদ্যালয় পরিদর্শন করি এবং তথ্য সংগ্রহকরি। এখানে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জেলা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ছক দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি। জেলা পর্যায়ের শিক্ষা অফিস হতে শুরু করে গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয় নমুনা জরিপ হিসেবে। এই নমুনা জরিপের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ঝরে পড়ার হার প্রভৃতি সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশ মালা প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি, এক তথ্যের সাথে অন্য তথ্যের অমিল, বিভিন্ন ফাইল ও ডকুমেন্টস সংরক্ষনের ক্ষেত্রে অবহেলা, তথ্য প্রদানে অনীহা এ সমস্ত সমস্যার সন্মুখীন হয়েছি। তারপরও মাঠ পর্যায়ের DPEO, UEO, AUEO তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বির্বতন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ- সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিনাংশে দক্ষিন এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশ ২০°৩৪ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং অপর প্রায় তিন দিকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭, ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। এদেশের জনসংখ্যা হচ্ছে ১২৮.২ মিলিয়ন (১৯৯৯) এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৬৯। এমন ঘনবসতিপূর্ন এলাকা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

এদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৬.৬ ভাগই মুসলমান। এছাড়া বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা শতকরা ১২.১ ভাগ, বৌদ্ধ শতকরা ০.৩ ভাগ এবং খ্রীষ্টানের সংখ্যা শতকরা ০.৬ ভাগ। এছাড়া ১.২ মিলিয়ন সংখ্যার নানান গোত্র ও বর্ণের আদিবাসী এদেশে বাস করে। অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষায় কথা বলে। এদেশের রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাহিত্য, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য যা এদেশের জনগন অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে। এদেশের পুরুষ ও মহিলার গড় আয়ু যথাক্রমে ৬০.৮ বছর এবং ৫৯.৬ বছর।[১]

২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী এদেশের শিক্ষিতের হার হচ্ছে ৬২%। এদেশের অর্থনীতি তত সমৃদ্ধ নয়। বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর বলা চলে। জিডিপির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ১৯৯৯/২০০০ হিসাব অনুযায়ী ৫.৮%। মাথাপিছু গড় আয় ৩৫০ আমেরিকান ডলার। মোট জাতীয় উৎপাদন ৩ লাখ ১২ হাজার ১৭০ মিলিয়ন ডলার (১৯৯৬)।[২]

১. পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় এবং ইউনিসেফ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (সম্পাদনায়)- প্রগতির পথে-২০০০, পৃষ্ঠা-৭।

২. ঐ, পৃষ্ঠা-৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবর্তন ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থারই ধারাবাহিকতা মাত্র। অবিভক্ত ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে কখন বাংলাদেশে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি। এদেশে বহু জাতির আগমন ঘটেছে এবং তাদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে নতুন জাতি যাকে বাঙালী জাতি বললে ভুল হবে না। দাবিড়, হূন, আর্য, মঙ্গোলীয়, আরব, তুর্কী, আফগান, মুঘল, পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত এ উপমহাদেশের আনুমানিক আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছরের ও পূর্বে বর্তমানের এ প্রাথমিক শিক্ষার বীজ রোপিত হয়।[৩]

বিভূতি ভূষণের কালজয়ী উপন্যাস পথের পাঁচালীতে শিশু অপু নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করত তার বিবরণ কম-বেশী অনেকের জানা। মুদি দোকানের পাশে খোলা ঘরে মাটিতে মাদুর পেতে শিক্ষার্থীরা বসত। প্রসন্ন গুরু মহাশয় দোকানের খদ্দের বিদায়, গ্রামবাসীদের সঙ্গে গল্প-গুজব এ সবের পরেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পড়া আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসে যেভাবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালার বর্ণনা আছে, তা থেকেই বুঝে নেয়া যায় আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার "শৈশব" অবস্থাটি ছিল কেমন। প্রসন্ন গুরু মশায়দের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে অপু'রা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার মৌলিক ভিত ছিল ওই সব গ্রাম্য পাঠশালা। পরবর্তীকালে এ ব্যবস্থা আরও প্রচলিত, প্রয়োগিত, সংশোধিত এবং বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।[৪]

বাংলাদেশের শিশুদের আনুষ্ঠানিক হাতে খড়ি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর শিক্ষা গ্রহণ করে। পাঁচ বছরে সে সহজ ভাষায় লিখতে এবং সহজ ভাষায় লেখা পড়তে শেখে। এ ছাড়া সে ভগ্নাংশ ও শতাংশের কিছু অংক কষে এবং দেশের ইতিহাস ও ভূ-পরিচয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে। তাই শিশুর মানবিক বিকাশের প্রথম সোপান হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু অক্ষর জ্ঞানই নয়, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর নূন্যতম স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

---

৩. শ্যামলী আকন্দর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম- "নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, প্রকাশক- মোহাম্মদ লিয়াকত উল্লাহ, ইউনেস্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন-১৪০৫। পৃষ্ঠা-৩

৪. দৈনিক জনকণ্ঠ- কেমন চলছে প্রাইমারী স্কুল-১, ৩০ বৈশাখ-১৪০৭ বাংলা, ১৩ মে-২০০০, পৃষ্ঠা-১১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশু তথা নারী শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে, বাংলাদেশে নারী সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে যে ধরণের শিক্ষা বোঝায় সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নারীর ক্ষেত্রে খুব বেশিদিন আগে থেকে শুরু হয়নি। যদিও মানুষের জন্মের পর থেকেই শিক্ষা শুরু হয় অর্থাৎ প্রবাহমান সময়, পরিবেশ, সমাজ, সংস্কার সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে নারী যে জ্ঞান অর্জন করে সেটাই শিক্ষা। আর তাই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর পরিবেশ, সমাজ, মর্যাদা, অবস্থান, গুনাবলী ও তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে যুগের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মেয়ে শিশু ও নারীর পুঁথিগত শিক্ষা অর্জন একদিন, দুইদিন বা এক বছর, দু'বছরে নয় যুগ যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে নানা ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন বিবর্তনের ধারায় দেখা গেছে যে, নারীর মর্যাদার সাথে তার শিক্ষার্জনের সুযোগ জড়িত, যা আজও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান। বিবর্তনের ধারায় নারী যেভাবে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান রূপ পরিগ্রহের পেছনে যে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নের ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ঃ[৫]

প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ-

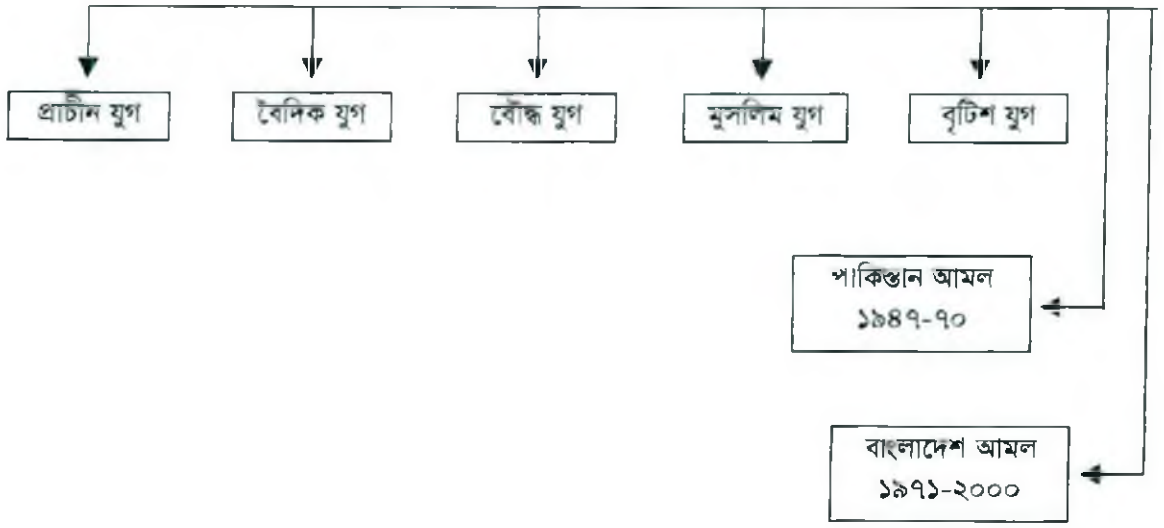

৫. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম- "নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, প্রকাশক- মোহাম্মদ লিয়াকত উল্লাহ, ইউনিক ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন-১৪০৫। পৃষ্ঠা-৩

Dhaka University Institutional Repository

২.১. নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ধারা ঃ

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষার আদিপর্বের সূচনা লগ্ন থেকে আজকের দিনে আমরা যে শিক্ষা ধারার সাথে পরিচিত। তার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে নারী শিক্ষার সম্পৃক্তা নির্নয় করাই মূলত এ লেখার প্রয়াস।

ইংরেজ এদেশে শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে অতি প্রাচীন একটি শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল এবং তা হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। শিক্ষা ছিল গুরুগৃহ, টোল মক্তব ও মাদ্রাসা কেন্দ্রীক এ শিক্ষা দেশের মানুষের ধর্ম, রাজনীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা এক দেশের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠে। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশের মাটিতে দেশীয় লোক দ্বারা এ শিক্ষা পরিচালিত ও লালিত হত। এ উপমহাদেশে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষার উত্তরাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বৈদিক শিক্ষা সাধারণত অভিজাত ব্রাহ্মণরাই গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ ছাড়া সাধারণ মানুষের অধিকার ছিল না বৈদিক শিক্ষায়। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়ে শিশুদের ক্রমবর্ধমান অবস্থান তুলে ধরাই আমার প্রয়াস।[৬]

২.১.১ প্রাচীন যুগ ঃ

সভ্যতার শুরুতে মানুষে মানুষে বা নারী পুরুষের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। সমাজ পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাথে সাথে নারী পুরুষ তথা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমশ ব্যক্তিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক প্রেক্ষাপটে এই পার্থক্য বাড়তে থাকে। এই পার্থক্যের কারণ নিরুপন এবং তা সমাধানের উপায় নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম অধিকার শিক্ষা মানুষের বুদ্ধি- বৃত্তিকে বিকশিত করে, নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে শেখায়। এটি মানব উন্নয়নে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ও বটে। অথচ নারী এবং পুরুষ মিলেই মানব সমাজ। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এই শিক্ষা সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শিক্ষার অভাব নারীকে করেছে পরাধীন, শৃংখলিত এবং বৈষম্য পীড়িত। এই বঞ্চনা ও নিপীড়ন তাদের মানুষ হিসেবে করেছে অধিকার বোধহীন, সচেতনতা বোধ-হীন, প্রতিবাদহীন। বলতে গেলে নির্জীব প্রায়। বাঁচার এ লড়াইয়ে প্রাচীন যুগ থেকে সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে মানুষ শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নানা চড়াই-উৎড়াই, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে তার অধিকার অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাচীন যুগ থেকে এভাবেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদির উত্থান-পতন, বিস্তার, বিকাশ, নারী শিক্ষার উদ্ভব তথা নারীর অগ্রগতির উপর প্রভাব ফেলেছে।[৭]

---

৬. ৬৪ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মাজিদা হোসেন, বাংলাদেশের শিক্ষা- [illegible], পৃষ্ঠা- ১। স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৭. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১-৩।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় মনে করা হতো ভারতবর্ষের আর্যদের আগমনের সময় থেকেই এদেশে ইতিহাস ও সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা আবিস্কারে ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির দিগন্তকে নতুনভাবে উদ্ভাসিত করেছে। ভারতীয় সভ্যতার এই প্রস্তর যুগ এবং সিন্ধু সভ্যতার তাম্র প্রস্তর যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক সূত্র মতে এই সভ্যতার জ্ঞান, বিকাশ, প্রসিদ্ধি ইত্যাদি নিরূপন অনেকটা অনুমান নির্ভর এবং আজও গবেষণা নির্ভর। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে এ সভ্যতায় যা কিছু পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে মেয়েদের অবস্থান সর্ম্পকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। তবে যে ধরণের পোড়ামাটির নিদর্শন বা মূর্তি সে সময়ে পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই নারী মূর্তি। এগুলো একদিকে যেমন সে সভ্যতায় মাতৃমূর্তি পূজা প্রচলনের ইঙ্গিত বহন করে। অপরদিকে মেয়েদের সম্মানের প্রতীকও ধরা যায়। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীল মোহর থেকে নাগরিকদের অক্ষর জ্ঞানের স্বাক্ষর মেলে। সে সভ্যতায় নারী শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও তারা যে লিখন পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিল, তা আবিস্কৃত হয়েছে।

মূলত প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিক্ষা বা নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা না গেলেও কৃষিকাজে মেয়েরাও অংশ নিত। এছাড়া কুম্ভকারের চাকার প্রচলন হবার পর এ চাকা মেয়েরাই ঘোরাত। তবে প্রয়োজনে ছেলেরাও এতে হাত লাগাত। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ ও প্রচলন তখন ও শুরু হয়নি।

২.১.২. বৈদিক যুগ ঃ

ইতিহাসের আদিপর্বে এ মহাদেশের জীবন ব্যবস্থায় ধর্ম একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং ভারতীয় জীবন দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে এর শিক্ষা দর্শনেও। বৈদিক কথাটি এসেছে ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে। বেদ অর্থ জ্ঞান। বেদই বৈদিক শিক্ষার মূল উৎস। বেদ পাঠের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন তথা ব্যক্তির মননশীলতার চর্চা ও উৎকর্ষ সাধন, সত্যের সন্ধান লাভই ছিল শিক্ষার্থীর ব্রত।[৮]

বৈদিক যুগের শুরুতে সমাজ ছিল বর্ণ ভিত্তিক। দুটি বর্ণ ছিল। গৌর ও কৃষ্ণ। গৌর হল বিজেতা এবং কৃষ্ণ হলো দাস। এ সময়ে পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা করত। তবে সমাজে নারীর স্থান ছিল। সে সময় পণ প্রথা, কন্যা পণ প্রথা উভয় নিয়মই প্রচলিত ছিল।[৯]

---

৮. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫।

৯. ডঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন, বাংলাদেশের শিক্ষা প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক শিক্ষার ধারক ও বাহক ছিলেন ঋষিগণ। প্রাচীন ভারতের আদি শিক্ষা গুরু ছিলেন এই জ্ঞান তাপস ঋষিরাই। সমগ্র বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রহ্মাচর্যাশ্রমকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো। শিক্ষার্থীদের পাঁচ বছর বয়স থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষা কার্যক্রম স্থায়ী হতো। পাঁচ বছর বয়সে শিশুর হাতে খড়ি দেয়া হতো। হাতে খড়ির পরও শিক্ষার্থীরা কিছু দিন পর্যন্ত গৃহেই অবস্থান করত। এর পর গুরু গৃহে যেতে হতো। এখানে শিক্ষণ-শিখনের (Teaching-learning) সূচনা হতো উপনয়নের মধ্য দিয়ে। 'উপনয়ন' অর্থ 'নিকেট যাওয়া'। উপনয়ন বলতে আবার ব্রাহ্মন বালকের পৈতা ধারণ করাকে বোঝানো হয়। বস্তুত উপনয়ন শিক্ষার্থীর শরীর ও মনের শুচিতা বিধান করে তাকে জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করত। বালক তখন শিক্ষার জন্য গুরু গৃহে গুরুর কাছে যেত। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে বালিকাদেরও উপনয়ন সমাপ্ত করে গুরু গৃহে যেতে হতো। মেয়েরাও গুরুর পরিচর্যা করে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। অর্থাৎ তখন মেয়ে শিশু এবং নারীদের স্থান মোটামুটি সম্মানজনক ছিল। কিন্তু যুগের শেষের দিকে ক্রমশ বর্ণভেদ জাতিভেদে রূপ লাভ করে। সমাজ চারটি শ্রেনীতে বিভক্ত হয়ে পড়ায় তখন মেয়েদের সম্মান এবং অধিকারের ক্ষেত্রেও শ্রেনীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করা হতো এবং এজন্য শোক প্রকাশ করা হতো। গৃহে, ধর্মাচরণে পুরোহিতদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের ফলে মেয়েদের অধিকার সংকুচিত এবং তাদের মর্যাদা কমে গিয়েছিল। সম্পত্তির অধিকার থেকেও নারীকে বঞ্চিত করা হয়। ক্রমান্বয়ে নারী জীবনের অসহায়ত্ব বেড়ে গিয়েছিল। "জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গি তখন বিশেষভাবে সংকুচিত হয়েছিল। বিদেশ ভ্রমন, সমুদ্র যাত্রা, অন্যের [ম্লেচ্ছ] ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করণের মধ্যে কুপমুন্ডকতার নির্ভুল প্রমান পাওয়া যায়"। (চট্টোপাধ্যায় সুনীল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৭, কলকাতা)।[১০]

২.১.৩. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

বৌদ্ধ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। তৎকালিন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামী যখন নারী সমাজকে ক্রমশ কোণঠাসা করে ফেলছিল গৌতম বুদ্ধ তখন মেয়েদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেন। তিনি মেয়েদের গৃহকোণ ছেড়ে সমাজের সব ধরনের কাজে অংশ গ্রহণের অধিকার স্বীকার করে নেন।

১০. উদ্বৃতঃ শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহানারা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪-৮

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল সঙ্ঘারাম। সঙ্ঘারাম গুলো বৌদ্ধ বিহার হিসেবেও খ্যাত। এগুলো নারী পুরুষ সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এখানে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সবারই প্রবেশাধিকার ছিল এবং শিক্ষা লাভের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করতে হতো। গণতন্ত্র ও সর্বজনীনতাই বৌদ্ধ ধর্মে ও জীবনের মূলমন্ত্র। বৌদ্ধ বিহারের নিয়ম প্রতিপালন ও ধর্মীয় আচরনে অভ্যস্ত করাই ছিল এ শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং জীবন গঠনে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহনের উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন ও নিবিড় পাঠানুশীলনই ছিল লক্ষ্য। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের জন্য ছিল পরিকল্পিত। বৌদ্ধ শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে শেখা ও শেখানোর ব্যাপারটি ছিল একান্তভাবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক। বৌদ্ধ বিহারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষার স্থলে দলগত শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার ঘটে। দলগত শিক্ষার প্রয়োজনে শ্রেনী শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং বৌদ্ধ বিহারগুলো এক একটি বড় ধরনের শিক্ষায়াতনে পরিনত হয়। পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা এই বৃহদাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে।[১১]

ভারতীয় উপমহাদেশে জন শিক্ষা বিস্তারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধরাই। সম্রাট অশোক প্রজা সাধারনের কল্যাণে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি ধর্মচারণ ও মানবীয় কল্যাণমূলক উপদেশ মালা পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ করে রাখার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার ওপর স্তম্ভলিপিতে ও তিনি নানা অনুশাসন খোদিত করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে মেয়ে শিশুদের যেখানে ব্যাপক অংশ গ্রহণ ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। শিক্ষার সর্বজনীনতা বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। আঞ্চলিক ভাষা ও প্রাকৃত ছিল জনশিক্ষার মাধ্যম। প্রাকৃত ছিল জনগণেরই ভাষা। ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটে।[১২]

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগ পরিক্রমায় সমাজে নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সম্মান ও মর্যাদার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায়, সভ্যতার উষালগ্নে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে নারীই প্রথম এগিয়ে এসেছিল। তবে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত নারী পুরুষের মধ্যে তেমন পার্থক্য না থাকলেও সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগে ভারতে মেয়ে শিক্ষা তথা নারী শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশের তথ্যাদি পাওয়া বা এর বিবরণ দেয়া কঠিন।[১৩]

---

১১. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৮-৯।

১২. ড. এম. এ. ওহাব, আব্দুল গণি সরকার, মনিরা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯-১৩।

১৩. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৪. মুসলিম যুগ ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে। বস্তুত এ উপমহাদেশের মধ্য যুগীয় গতিহীন জীবনে নবতর জীবনবোধের সঞ্চার হয়। নবতর জীবনবোধ এদেশের মানুষকে জ্ঞানের চর্চায় উৎসাহী করে তোলে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়।

ইসলামি সমাজে শিক্ষা লাভ তথা শিক্ষাদেয়া ধর্মীয় কর্তব্য ছিল বলে আলেম সম্প্রদায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন এবং শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য দান করতেন। এ উদ্দেশ্যে সুলতানী আমলে সুলতানরা আলেম, শেখ, সৈয়দ এবং অন্যান্য পন্ডিতদের এনাম, বৃত্তি ও জায়গীর ইত্যাদি প্রদান করতেন। তাঁরা নিজেদের বাস-ভবনে মাদ্রাসা তৈরি করে ছেলে মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা দেয়ার জন্য সুলতান এবং উচ্চপদস্থ আমীর ও ওমরাহগণ বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন করেন। ফলে মুসলমানদের শাসনামলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।[১৪]

মুসলিম যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানবিক জ্ঞানের বিকাশ সাধন, সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করণ, ধর্ম পরায়নতাবোধ জাগরণ এবং মঙ্গল সাধন। মূলত সুলতানী আমলেই শিক্ষায় নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি, বর্ণ বা ধর্মের বিচারে নয়, শিক্ষার অধিকার সকলেরই সমান এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান ও হিন্দু নারী ও পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এস, এম জাফর তাঁর "Education in Muslim India" গ্রন্থে লিখেছেন "In the Muslim schools that were started in India Hindus, who had hitherto been deprived of the intellectual feast, began to receive education side by side with their Muslim class follows and there existed no feelings of prejudice, ill will or enmity between the two in so far as education was concerned." [১৫]

---

১৪. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৩৩-৩৪।

১৫. উদ্বৃতঃ ড. এম. এ. ওহাব, আব্দুল গণি সরকার, মনিরা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী প্রকৃত অর্থে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। পরবর্তী সুলতানাদের মধ্যে কুতুব উদ্দীন আইবেক ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাগুলো শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহৃত হত। মক্তবগুলোই ছিল প্রাথমিক শিক্ষালয় এবং মাদ্রাসা ছিল উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে মসজিদের গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য মসজিদের ইমামই ছিলেন শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তুত পড়তে ও লিখতে পাড়া এবং হিসাব নিকাশ জানার মধ্যেই সীমিত ছিল। সাধারণভাবে সাত বৎসর বয়সে মক্তবের শিক্ষা শুরু হতো, তবে শিশুর বয়স চার বছর পুরো হলেই 'সবক' বা হাতে খড়ি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।'সবক' অনুষ্ঠানে শিশুকে নতুন জামা-কাপড় পড়িয়ে পবিত্র কোরান থেকে অংশ বিশেষ আবৃত্তি করানো হতো। শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহ খানি' অনুষ্ঠান নামেও পরিচিত ছিল। মুসলিম ধর্মে বিদ্যার্জন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল বলে মুসলমানগণ তাদের কন্যা সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। 'কানুন-ই-ইসলাম' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় মুসলমান মেয়েরা সাত বছর বয়স পর্যন্ত মক্তবে পড়াশোনা করতে পারত। সমাজে পর্দা প্রথার ফলে সাধারণ মেয়েদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শ্রেনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত শ্রেনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই শিক্ষার কোন নিয়মিত পদ্ধতি ছিল না, তবে তৎকালীন শাসকগণ কর্তৃক তাদের মেয়েদে শিক্ষার জন্য ক্রমান্বয়ে মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন নারী শিক্ষার প্রসারে তথা নারীকে পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেছিল।[১৬]

ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা আজও কিংবদন্তী হয়ে আছে। বিশেষ করে মুঘল সম্রাটদের অবদান শিক্ষা ক্ষেত্রের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করে। সম্রাটগণ শিক্ষার পরিমাণ ও গুনগত মান বৃদ্ধি উভয় দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। সে সময় নারী শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাধারা হিসেবে পরিগনিত হয়। উচ্চ বংশীয় ও বিত্তবানের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করত এবং অন্ত:পুরে নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। ফলে নারী শিক্ষার জন্য প্রচুর মাদ্রাসা, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে সম্রাট আকবর মেয়ে শিশুদের যথেষ্ট পৃষ্টপোষকতা করেন ও নারী শিক্ষায় অবদান রাখেন। তিনিই সর্ব প্রথম মেয়েদের জন্য পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফতেহপুর সিক্রির অন্দর মহলেই ছিল আকবরের প্রতিষ্ঠিত হেরেমের বালিকা বিদ্যালয় বা জেনানা বিদ্যালয়। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্যই লেখা-পড়ার ব্যবস্থা ছিল। মুঘল আমলে অনেক সুশিক্ষিতা নারীর পরিচয় মেলে। সম্রাট বাবরের কন্যা গুলবদন 'হুমায়ুন নামা' রচনা করেন। সলিনা সুলতানা উচুঁদরের কবি ছিলেন। নুর জাহান, জাহানারা, জেবুন্নিসা-এঁরা সকলেই বিদুষী মহিলা ছিলেন।[১৭]

---

১৬. ড. এম. এ. ওহাব, আব্দুল গণি সরকার, মনিরা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮-২২।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৫. বৃটিশ যুগ ঃ

আজকের দিনে আমরা যে শিক্ষাধারার সাথে পরিচিত তাঁর সূচনা ঘটে ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে আসবার পর। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের আগে বানিজ্যিব জন্য পর্তুগীজ ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের এদেশে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বাস করতে হতো। তখন স্কুল খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য। সেসময় বণিকদের সাথে মিশনারীরাও এদেশে আগমণ করেন। তারাই বিশেষ করে ধর্ম প্রচারের অপরিহার্য উপকরণ রূপে শিক্ষা বিস্তারকে গ্রহণ করলেন। মিশনারীরা খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষা শিখে তাঁরা বাইবেলের অনুবাদ, খ্রিষ্টের বাণী প্রচার এবং দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার লাভ করার পর ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব কোম্পানীর হাতে ন্যাস্ত হয়। ইংরেজ এদেশে শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে অতি প্রাচীন একটি নিজস্ব শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল যা দেশীয় শিক্ষা নামে পরিচিত ছিল। এ শিক্ষা ছিল গুরুগৃহ, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা কেন্দ্রিক। এ শিক্ষা দেশের মানুষের ধর্ম, রীতি নীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, এদেশের আবহাওয়া ও মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠে। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে বিদেশী শাসকগণ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। তাছাড়া যে সকল বৃটিশ কর্মকর্তা শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন তারা প্রায় সবাই দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অকেজো, প্রাণহীন ও অচল বলে কটাক্ষ ও বৈরী মনোভাব পোষণ কবতেন। তাঁরা চেষ্টা করতেন দেশীয় শিক্ষাকে কিভাবে এদেশের মাটি থেকে মুছে ফেলে তদস্থলে ভিন্ন সংস্কৃতিতে লালিত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে ইংরেজী শিক্ষাকে এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। "শুধুমাত্র কোম্পানীর সুবিধার্থে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর বিচার ও শাসন বিভাগীয় সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে কতগুলো প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। এগুলোর মধ্যে ছিল কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রী.) বারানসীর সংস্কৃত কলেজ (১৭৯১ খ্রী.), কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রী.) ইত্যাদি। মেয়েরা কোম্পানীর কর্মচারী হতে পারবে না বলে তাদের শিক্ষাদীক্ষার কথা ভাবারও দরকার মনে করা হয়নি। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে অন্তত এক লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তার এক কপর্দকও নারী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়নি।[১৮]

---

১৮. জেসমিন বিকাশ চৌধুরী, মুহাম্মদ ইয়ামে ইনাম, শিক্ষার ইতিহাস- ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া (সম্পাদনা) স্কুল অব এডুকেশন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর- ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৬২

Dhaka University Institutional Repository

১৮১১ সালে লর্ড মিন্টো ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতি সম্পর্কে এক বিবরণী কোম্পানীর কাছে পেশ করেন। বস্তুত ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের মাধ্যমে এদেশে বৃটিশরা আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন।[১৯]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮২৩ সালে বেঙ্গল প্রদেশের জন সাধারণের শিক্ষাদান কার্য পরিচালনার জন্য দশ সদস্য বিশিষ্ট জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন গঠিত হয়। সনদ আইনের বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকা খরচের ভার উক্ত কমিটির হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে আরবি ও সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক বেশি থাকায় কমিটি---

* কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ পূর্ণ গঠণ করেন ;
* ১৮২৪ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন ;
* দিল্লী ও আগ্রায় দু'টি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন ;
* আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন ;
* দেশীয় পন্ডিতদের নিয়োগ করে জ্ঞান বিজ্ঞানের ইংরেজী পুস্তক সমূহ প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন ;[২০]

কিন্তু কোম্পানীর ডিরেকটরগণ কমিটির সাথে দ্বিমত পোষন করেন এবং তারা মনে করেন আরবি ও সংস্কৃত ভাষার কাব্য মর্যাদা থাকলে ও এতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কিছু নেই এবং এর দ্বারা অশিক্ষা কুশিক্ষাই প্রসার লাভ করবে। এ সময় লর্ড বেন্টিক লর্ড মেকলেকে শিক্ষা কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন এবং লর্ড মেকলে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের অনুকুলে রায় প্রদান করেন। লর্ড মেকলের কথায় এ নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও নীতি হলো ঃ-

"বর্তমানে আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োগ করে এমন এক শ্রেনী গড়ে তুলতে হবে যারা আমাদের আর আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি তাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা হবে এমন এক শ্রেনীর যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধি বৃত্তিতে ইংরেজ। এই শ্রেণীর কাছে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে দেশীয় ভাষা সমূহের উন্নয়নের, পাশ্চাত্য শব্দ সংগ্রহ করে এই সব ভাষার শ্রীবৃদ্ধির এবং ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য এ সব ভাষাকে উপযুক্ত মাধ্যম করে তোলার। (বক্তব্যগুলো অবিভক্ত বঙ্গকে লক্ষ্য করে যার অধিকাংশ এখন বাংলাদেশ । এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, মুহাম্মদ শামস উল হক, বিকাশমান সমাজ ও শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৬২)।[২১]

---

১৯. শ্যামলী আকবর সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৩।

২০. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৫।

২১. মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ মনজুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড মেকলের এই শিক্ষা নীতি বাস্তবায়িত করার ফলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চিরতরে পঙ্গু হয়ে পড়ল। এ নীতির ফলে অবশ্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও সরকারী পৃষ্ঠপোষিত শ্রেনী পাশ্চাত্য মাধ্যমিক ও উচ্চতরের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সীমাবদ্ধ সুযোগ পেলেন। কিন্তু শিক্ষা পরিস্রুত হয়ে জনগণের কাছে পৌছবার পরিকল্পনা কোনদিনই কার্যকর হল না। যদিও তার সুপারিশ মেনে জেলা সদরে একটি করে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু হলেও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যত অবহেলিত ছিল। পরবর্তীতে লর্ড বেন্টিক শিক্ষা উন্নয়নের কাজ শুরু করার আগে এদেশের প্রচলিত শিক্ষা অবস্থা জানার জন্য জরিপ কাজ শুরু করেন। এরই অংশ হিসেবে ১৮২৬ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের এবং ১৮২৯ সালে বোম্বে প্রদেশের গর্ভণর নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারীভাবে রির্পোট পেশ করেন। উল্লেখ্য যে এ রির্পোটগুলো ছিল অসম্পূর্ণ । এই অবস্থায় স্কটল্যান্ডবাসী সহৃদয় মিশনারী উইলিয়াম এ্যাডাম স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ম্পকে তদন্তের ভার গ্রহন করেন। ১৮৩৫ সালে বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিক বাংলা ও বিহার প্রদেশের দেশীয় শিক্ষা সর্ম্পকে রির্পোট প্রনয়নের জন্য তাকে শিক্ষা কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা ও বিহারের মোট সাতটি জেলায় সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করে তিনটি ভিন্ন রির্পোট সরকারের কাছে পেশ করেন। এ্যাডামের জরিপই বাংলাদেশে সর্ব প্রথম শিক্ষা জরিপ। তিনি সাতটি সুপারিশ ও পেশ করেন। যদিও তা কার্যকর হয়নি কিন্ত ওই জরিপ থেকে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সর্ম্পকে গুরুত্বপূর্ন তথ্য পাওয়া যায়।

অ্যাডাম তার রির্পোট বলেছেন যে, তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে এদেশের মেয়েরা ডুবেছিল। এদেশের মেয়েদের জন্য পৃথক কোন বিদ্যালয় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তৎকালিন সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কারনেই মেয়েদের শিক্ষা ছিল অবহেলিত। অ্যাডামের রির্পোটে দেখা গেছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতি ৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ৪ জন নারী অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিল। মেয়ে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে দেশের পুরুষ সমাজ বিশেষ রক্ষনশীল ছিলেন । তাঁরা মেয়েদের জন্য নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের ঘরোয়া লেখা পড়া আয়োজন করে সন্তুষ্ট ছিলেন।[২২]

❑ অ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট ঃ

১৮৩৫ সালের ১লা জুলাই অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন। তার বিবরণীতে বলা হয় বাংলা ও বিহারের লোক সংখ্যা ছিল ৪ কোটি এবং বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। প্রতি চারশ জনের জন্য ১টি বিদ্যালয় ছিল। গ্রামের সংখ্যা ছিল ১,৫০,৭৪৮ টি। গ্রামের সংখ্যানুসারে প্রতি ৩টি গ্রামের জন্য ২টি বিদ্যালয় ছিল। অ্যাডাম স্কুল বলতে আধুনিক ধরনের যে স্কুল আমরা বুঝি, তা মনে করেননি। তখন গৃহ শিক্ষা র ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। কোন পরিবারে শিক্ষক দিয়ে বা আপন পরিজনদের দিয়ে এককভাবে অথবা সমষ্টিগত ভাবে যে শিক্ষা দেয়া হতো তাকে ও বিদ্যালয় বলা হত।[২৩]

---

২২. শ্যামলী আকবর সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৭০

২৩. ডাঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, নলিনা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

❑ অ্যাডামের দ্বিতীয় রির্পোটঃ

অ্যাডাম রাজশাহী জেলার প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করেন। যেমন সাধারন শিক্ষা ব্যবস্থা ও গৃহশিক্ষা ব্যবস্থা । তিনি রাজশাহী জেলার নাটোর থানাকে কেন্দ্র করে ১৮৩৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তার রির্পোট পেশ করেন। তার বিবরণী অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যার নিম্নরুপ হিসেবে পাওয়া যায়।

	বিদ্যালয়	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১।	বাংলা স্কুল	১০	১৬৭
২।	ফারসী স্কুল	০৪	২৩
৩।	আরবী স্কুল	১১	৪২
৪।	বাংলা ও ফারসী স্কুল	০২	৩০
	মোট	২৭	২৬২

সাধারন বিদ্যালয়ে পাঠ্যরত ছাত্রের সংখ্যার চেয়ে গৃহে পাঠ্যরত ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ গুন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার গড় বয়স ছিল ৮ বছর ও বিদ্যালয় ত্যাগের গড় বয়স ছিল ১৪ বছর। গড়ে প্রতি শিক্ষক মাসে বেতন পেতেন ৫ টাকা ৮ আনা। নারী শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না।[২৪]

❑ এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট ঃ

১৮৩৮ সালের ২৮ শে এপ্রিল এ্যাডাম তৃতীয় বিবরণী পেশ করেন। এ বিবরণী ২টি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে মুর্শিদাবাদ বীর ভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত বাংলা ও বিহারেব এ পাঁচটি জেলায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি দেশীয় বিদ্যালয় গুলো সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করেন। অ্যাডাম উক্ত পাঁচটি জেলায় ৮ রকমের মোট ২৫৭৬ টি বিদ্যালয় খুঁজে পান।[২৫]

বিদ্যালয়	সংখ্যা
বাংলা বিদ্যালয়	১০৯৯
হিন্দী বিদ্যালয়	৩৭৬
সংস্কৃত বিদ্যালয়	৩
ফারসী বিদ্যালয়	৬৯৪
আনুষ্ঠানিক আরবী বিদ্যালয়	৩
আরবী বিদ্যালয়	৩৮
ইংরেজী বিদ্যালয়	৪
বালিকা বিদ্যালয়	৬

২৪. ডাঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৩৬।

২৫. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত ছকে পাঁচটি জেলার বিদ্যালয় ও ছাত্রের একটি সাধারন পরিসংখ্যান দেয়া হলো -----

জেলা	মোট লোক সংখ্যা	বিভিন্ন রকমের বিদ্যালয় সংখ্যা	মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা	শুধু ছাত্রীর সংখ্যা
মুর্শিদাবাদ	১,৮৬,৮৪১	১১৩	১৩৯৬	২৮
বীর ভূম	১২,৬৭,০৬৭	৫৪৪	৭৩৫০	১১
বর্ধমান	১১,৮৭,৫৮০	৯৩১	১৫,৮১৪	১৭৫
দক্ষিন বিহার	১৩,৪০,৬১০	৬০৫	৫,৩০৬	--
ত্রিহুত	১৬,৯৭,৭০০	৩৭৪	১,৩১৯	--
	৫৬,৭৯,৭৯৮	২৫৬৭	৩০,৯১৫	২১৪

তখন শিক্ষিতের হার ছিল ৬.১%[২৬]

শিক্ষার মাধ্যম ঃ

যে সাতটি জেলায় অ্যাডাম ভ্রমণ কাজ চালিয়েছিলেন সে জেলাগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম নিম্নে ছকে দেখান হল-

জেলা	মাধ্যম
রাজশাহী	বাংলা
মুর্শিদাবাদ	বাংলা / হিন্দি
বীরভূম	বাংলা / হিন্দি
বর্ধমান	বাংলা
দক্ষিণ বিহার	হিন্দি
ত্রিহুত	হিন্দি
মেদেনীপুর	উড়িয়া/বাংলা

ছক : বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম।[২৭]

২৬. ডাঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, নলিনা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৩৭।

২৭. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় গৃহ ঃ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন বিদ্যালয় গৃহ ছিল না। যদি কোথাও এমন বিদ্যালয় গৃহ তৈরি হতো তবে তা শিক্ষকের প্রচেষ্টায় অথবা গ্রামের ধনী লোকের সহায়তায় তৈরি করা হতো। সাধারণত হিন্দুদের চন্ডীমন্ডম, বাড়ীর বৈঠকখানা, কোন লোকের বাসগৃহের বারান্দায়, দোকানের কোণে, মসজিদের কামরায় অথবা গাছের নীচে বিদ্যালয় বসত।

শিক্ষক ঃ

অ্যাডাম অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বলেছেন শিক্ষার ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত সমাজ গঠনের মূল কেন্দ্রবিন্দু যে শিক্ষক তার এত স্বল্প আয়ে তিনি কিভাবে টিকে থাকতেন এবং এই গুরু দায়িত্ব পালন করতেন? এদেশের শিক্ষক সমাজ অতি প্রাচীন কাল থেকে কঠোর ত্যাগের মাধ্যমেই জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। শিক্ষাদান করাকে পূণ্যের কাজ বলে ভাবতেন। তাঁর ভাষায় "শিক্ষকরা ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল, দরিদ্র এবং অজ্ঞ"।[২৮]

পাঠ্যক্রম ঃ

লেখা, পড়া, বর্ণ গঠণ এবং প্রাথমিক হিসাব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত ছিল। লেখার সামগ্রীর ভিত্তিতে সমগ্র পাঠ্যক্রমকে চারভাগে ভাগে করা হয়েছিল। যথা ঃ-

*	মাটির উপর লেখা	ঃ	১০ দিন।
*	তালপাতায় লেখা	ঃ	আড়াই বছর থেকে ৪ বছর।
*	কলাপাতায় লেখা	ঃ	২ বছর থেকে ৩ বছর।
*	কাগজে লেখা	ঃ	২ বছর।[২৯]

২৮. ডাঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৩৮।

২৯. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

❑ দেশীয় শিক্ষা উন্নয়নে অ্যাডামের সুপারিশ ঃ

উইলিয়াম অ্যাডাম মনে করেন যে, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও জাতীয় শিক্ষা কাঠামো গঠণে তা ছিল একমাত্র নিশ্চিত ভিত্তি। সেজন্য অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কতগুলো সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেন ঃ

* প্রথমেই নির্বাচিত জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

* শিক্ষক ও ছাত্র/ ছাত্রীদের উপযোগী করে মাতৃভাষা দেশীয় ভাষায় একপ্রস্থ পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার প্রচার করতে হবে।

* প্রতি জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠ রূপায়নের জন্য একজন পরীক্ষক নিযুক্ত করতে হবে।

* শিক্ষকদের বই পড়তে উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষকগন স্কুল ছুটির সময় বছরে একমাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত একাদিক্রমে চার বছর কালের মধ্যে তাঁদের শিক্ষন-শিক্ষা সমাপ্ত করবেন।

* শিক্ষন-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগন সেই শিক্ষা ছাত্রদের দান করবেন। ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহন ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

* শিক্ষকদের গ্রাম থেকে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করবার জন্য তাঁদের ভূমিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

অতঃপর দশজন ইউরোপীয় সদস্য বিশিষ্ট "কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন" সীমাবদ্ধ এলাকায় অ্যাডামের পরামর্শ পরীক্ষা করে দেখতে প্রস্তুত হলেও ইংল্যান্ডস্থিত কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস' তৎকালিন সরকার সমর্থিত লর্ড মেকলের মতামতই গ্রহন করলেন এবং লর্ড বেন্টিক অ্যাডামের পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন না করে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে বাতিল করে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেন। ফলে অগণিত দেশীয় বিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রীয় সমর্থনের অভাবে ক্রমে ক্রমে অবনতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল।[৩০]

৩০. ডাঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৪১-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

❑ উডডেস প্যাচ রিপোর্টঃ

পরবর্তীতে জনগণের জন্যে শিক্ষার দাবী সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয় ১৮৫৪ সালের ঘোষণায়। দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন এবং জন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তৎকালীন বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের তত্ত্বাবধানে এমটি শিক্ষা দলিল প্রনয়ন করেন, যা 'উড ডেস প্যাচ' নামে পরিচিত। শিক্ষার স্তর বিভাজন পদ্ধতির নিরিখে উড ডেস প্যাচ- এ প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই দলিলকে ম্যাগনা কার্টা বলে অভিহিত করেন। এই রির্পোটের ফলে ১৮৬৫ সালের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ গঠন এবং কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। অনুদান প্রথা চালু করে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের জন্য নর্মাল ও মডেল স্কুল স্থাপন করা হয়। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা এবং আইন, চিকিৎসা ও প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারের ওপর ডেস প্যাচে গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীর পাশাপাশি দেশীয় ভাষার (যার যার মাতৃভাষা) ওপর জোর দেয়া হয়। উডের ডেসপ্যাচে নারী শিক্ষা প্রসারে সরকারী ইচ্ছা প্রকাশ পেলেও প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। এতে সরকারী সাহায্য ও সহযোগীতার কথা ব্যক্ত করা হয়। ফলে ১৮৫৭ সালে বাংলার ছোট লাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মনোযোগী হন। ফলে তারই অনুরোধে ঈশ্বরচন্দ বিদ্যাসাগর বিভিন্ন এলাকায় অবৈতনিক স্কুল খোলেন।[৩১]

❑ হান্টার কমিশনঃ

তবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে স্যার ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারকে সভাপতি মনোনীত করে "ভারতীয় শিক্ষা কমিশন" গঠনের পর। ১৮৮২ সালে গঠিত কমিশন পরের বছর ২শ' ২২টি সুপারিশ সংবলিত ৬শ' পৃষ্ঠার 'হান্টার কমিশন' রির্পোট পেশ করে। রির্পোটে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষা হলো জনশিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।[৩২]

কমিশনের সুপারিশ সমূহ ঃ

প্রাথমিক শিক্ষাঃ কমিশন বুঝতে পেরেছিল দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে হলে সর্ব শ্রেনীর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৩৬টি সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা। জীবনের পক্ষে যা সর্বপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সে সব বিষয়ই শেখানো হবে। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষারূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জনসাধারণ যাতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়, সে জন্য হার্ডিঞ্জের ঘোষিত নীতি অনুসারে সরকারী নিম্নতম কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর অপেক্ষা সামান্য শিক্ষিতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অনগ্রসর জেলাগুলোতে প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৩]

---

৩১. শ্যামলী আকবর, তাহমিনা আকতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

৩২. ডাঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৮৯।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা ব্যবস্থা ঃ

ইংল্যান্ডের শিক্ষা আইনে (১৮৭০) প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে দেয়া হয়। কমিশন এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেন এবং এই আঞ্চলিক স্বায়াত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ এলাকার জন্য একটি শিক্ষাবোর্ড গঠণ করবে। যে বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে দায়ী থাকবে। [৩৪]

এই সমস্ত কর্মসূচীর পাশাপাশি ১৮৬০-১৮৭০ এর দশকে নারী ও মেয়ে শিক্ষার ধারনাকে ও এর সুফলকে মেনে নিতে থাকে। ফলে অনেকে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন।

বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি ও সংখ্যা ঃ

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	বালিকার সংখ্যা
১৮৬০	৯৫	২,৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬,৭১৭
১৮৮১	১০৪২	৪৪,০৯৬
১৮৯০	২,২৩৮	৭৮,৮৬৫

উৎস ঃ জেনারেল রির্পোট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন, ১৮৩৬-৬৪, ১৮৭১-৭২, ১৮৮১-৮২, ১৮৯০-৯১.[৩৫]

১৯০১ সালে লর্ড কার্জনের আমলেও শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে ১শ, ৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবের প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যয়ভার তার বেশিটাই সরকার বহন করতে থাকে। পরিমান গত বিকাশ এবং গুনগত মানের উন্নয়ন, উভয়েই ছিল লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষানীতির উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য ।

এই নীতির অনুকুলে তিনি নিচে উল্লেখিত পদক্ষেপ গুলো গ্রহন করেনঃ

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তার মতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের মেয়াদ কমপক্ষে দু'বছর হওয়া উচিত।
* প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচী সম্প্রসারন ও পরিমার্জনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।
* লর্ড কাজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শরীর চর্চাকে সর্বজনীন করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

---

৩৪. ডাঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৯০।

৩৫. শ্যামলী আকবর, তাহমিনা আকতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও তিনি বৃদ্ধি ঘটান।[৩৬]

প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে তিনি ইংরেজী শিক্ষার উপর তাগিদ দেন। লর্ড কার্জনের প্রস্তাব মতো প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ঘটলে ও পাশা পাশি গ্রামের বিত্তবান কিংবা জমিদারদের উদ্যোগে মক্তব বা পাঠশালা অথবা ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা চালু ছিল।

লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নতুন নীতি নিধারিত হয় তারই ফলে ১৮৯৯ সালে 'ডিরেক্টর জেনারেল অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' নামে একটি পদ সৃষ্টি করলেও ১৯১০ সালে এ পদটি বিলোপ করে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের শিক্ষাবিষয়ক সদস্যের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া ১৯১০ সালে গোপাল কৃষ্ণ গোকুল আইন পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি বিল প্রেরন করেন। কিন্তু ১৯১২ সালে বিলটি বাতিল করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে অবৈতনিক 'নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক আইন' আইন পাশ করা হয়। প্রথমে এর পরিধি ছিল মিউনিসিপ্যালিটি গুলোর মধ্যে সীমিত, পরে ১৯২১ সালে গ্রামের ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়।

এছাড়া ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশন একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে সুপারিশ পেশ করেন। **১৮৮২ সালে হান্টার শিক্ষা কমিশন ১৯০২ সালে লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার, ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশনে নারী তথা মুসলমান নারীদের অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল ও প্রয়োজনে কলেজ স্থাপন, বিশেষ বৃত্তি প্রদান, পৃথক পাঠ্যসূচী প্রনয়ন, নারী পরিদর্শক নিয়োগ ও শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করে**। কিন্তু মুসলিম ও বিশেষ বিশেষ পরিবারের সন্তানদের জন্য সুপারিশ গুলো জাতীয় সংহতির পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কাজেই সুপারিশ গুলো বাস্তবে যথাযথ রুপায়িত হয়নি। তাছাড়া বিদ্যালয়ে বালিকাদের যোগদান বাধ্যতামূলক না হওয়ায় এ বিষয়ে সরকার ও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেয়নি। পরবর্তী শিক্ষা কমিশন গুলোতে নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা হলেও বাস্তবে এগুলোর ফলপ্রসু প্রয়োগ তেমন হয়নি।

❑ সার্জেন্ট কমিশনঃ

ভারত সরকারের কেন্দ্রিয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা ১৯৪৩ সালে শিক্ষা উপদেষ্টা জন সার্জেন্টকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৪৪ সালে এই কমিটি রিপোর্ট প্রদান করেন, এটি সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। কমিটি যে সুপারিশ মালা প্রেরন করেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষার মান সেখানে পৌছে দেয়া। সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশে বলা হয়-

---

৩৬. ডঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

* প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হলেও সর্বদা অবৈতনিকরূপে পরিচালনা করতে হবে।
* ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-Primary Education)।
* ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষা। এ শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করার সুপারিশ করা হয়-
    ১) ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিম্ন মৌলিক শিক্ষা স্তর (Junior Basic Education Stage) এবং
    ২) ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জ্য উচ্চ মৌলিক শিক্ষা স্তর (Senior Basic Education Stage)।
* ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি থাকতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নার্সারী বিদ্যালয়ও।
* মাতৃভাষার মাধ্যমে বাস্তব ও কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে শিক্ষয়িত্রীদের দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করা।
* শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* বাধ্যতামূলক শারীরিক শিক্ষা, শিশুদের চিকিৎসা পরবর্তী পরিদর্শন এবং অপুষ্ট শিশুদের জন্য দুধ ও মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা।
* দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

সামগ্রিক অর্থে বলা চলে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বাস্তব ও কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার উপর সার্জেন্ট কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেন।[৩৭]

২.১.৬. পাকিস্তান যুগ ঃ

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট এ উপমহাদেশে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। বৃটিশরা এ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার যে ভিত তৈরি করে তাই পরবর্তীকালে অনুসৃত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় দেখা যায় পূর্ববঙ্গে ২৪ হাজার ৭শ' ৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং সে সময় জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি।

৩৭. ডঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৮-৮৪, ৯৫-১১২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার করাচিতে একটি পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন আহবান করে। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রানিত হবে, তবে তার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এর পাশাপাশি এই শিক্ষা সম্মেলনে ৬-১১ বছরের শিশুদের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার সুপারিশ রাখা হয়েছিল যদিও বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

"স্বাধীনতা উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন এবং তার উপযুক্ত সংগঠণ করা প্রয়োজন"। [উমর ১৯৭০, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬] এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু রাজনৈতিক এবং ছাত্র-কর্মীরা একমত হয় এবং একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষা বিষয়ক বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন- বাংলাভাষা হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের অন্যতম ভাষা। "শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজের মাতৃভাষায় বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের রয়েছে এবং তা তাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে"।[৩৮]

স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে সাজানের চেষ্টা চললেও নারী শিক্ষা বিশেষ করে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থায় গিয়ে দাড়িয়েছিল। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ৫২.৩% মুসলিম এবং ৪৫.২% ছিল হিন্দু। কিন্তু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুরাই ছিল অগ্রগামী। দেশ বিভাগের ফলে হিন্দু জনগণ এদেশ ছেড়ে যেতে থাকলে, এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতার "যুগান্তর" পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী জানা যায়, বৃটিশ আমলে পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার যে অবস্থা ছিল, পরবর্তীতে তাও প্রায় বিলুপ্ত হবার পথে। "একমাত্র রাজশাহী জেলায় ৩৬০টি প্রাথমিক বালক এবং ৩০০টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় উঠে যায়"। ইসলামী রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে ক্ষমতাসীন চক্র স্কুল কলেজের মেয়েদের আগমনে বাধা দিয়ে আবার তাদেরকে অজ্ঞতার শৃঙ্খলে নিক্ষেপের প্রচেষ্টা চালায়। ফলে বাঙ্গালীদের বুদ্ধিভিত্তিক ঐতিহ্য নতুন রাষ্ট্রে লুপ্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কমিশন রিপোর্ট তৈরি করে শিক্ষা ব্যবস্থা ও মেয়েদের শিক্ষার বিভিন্ন দিকের প্রতি সুপারিশ রাখা হয়।[৩৯]

---

৩৮. শ্যামলী আকবর, তাহমিনা আকতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৫।

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

❑ **মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান শিক্ষা কমিটি ঃ**

জনগণের অনুভূতির প্রতি অনুকুল সাড়া দিতে গিয়ে সরকার জনগণের শিক্ষা সমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য সতেরো সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক আকরাম খান পূর্ব বঙ্গ প্রস্তাব নং-৫৯ মোতাবেক গঠিত "পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুর্নগঠন কমিটি" নামে পরিচিত এ কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এটিই 'আকরাম খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ১৯৫২ নামে পরিচিত। কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মদ্রাসা, নারী, সংখ্যালঘু, শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো হল ঃ-

১. পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি সুনির্দিষ্ট স্থান থাকা উচিৎ এবং এজন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াক্রমে অগ্রসর হতে হবে।

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বা দুইটি শ্রেনী থাকবে এবং বিশেষ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত মহিলা শিক্ষিকার মাধ্যমে অনুর্ধ্ব ছয় বছরের শিশুর শিক্ষাদান করা হবে।

৩. জনবহুল শহরে এবং শিল্প এলাকা পূর্ণাঙ্গ কিন্ডার গার্ডেন স্থাপন করতে হবে। এছাড়া সরকারকে বিশেষ বিশেষ এলাকায় কিন্ডার গার্ডেন স্থাপন করতে হবে।

৪. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক কাজ ও খেলাধুলার মাধ্যমে শ্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

৫. পৌর প্রতিষ্ঠান, কারখানা ইত্যাদির মত বড় প্রতিষ্ঠানে শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র নার্সারী স্থাপন করতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৌনাপৌনিক আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. দেশের ছয়টি রেঞ্জে এর সদর দপ্তরে মহিলাদের জন্য ছয়টি পিটিআই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এগুলোতে "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা" নামে একটি বিশেষ কোর্স প্রবর্তন করা হবে।[৪০]

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ ঃ

১. এই প্রদেশের সর্বজনীন ফ্রি ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সর্বাধিকারের ভিত্তিতে প্রবর্তন করতে হবে।

২. সহ শিক্ষা নয় বছর বয়স পর্যন্ত হবে এবং পরবর্তী শিক্ষা পৃথক হতে হবে।

৩. কর্ম ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থাকে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. শিক্ষাক্রম প্রনয়নে শিশু ও জনগণের কল্যাণকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

---

৪০. শ্যামলী আকবর, তাহমিনা আকতার, জাহান আরা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রাথমিক স্তরের বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা ২৮টি হওয়ার অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে এই স্তরের জন্য সর্বমোট ১৫টি পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা।

৬. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মহিলা হওয়া বাঞ্চনীয় সেহেতু মহিলাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৭. এদেশের জন্য একটি মহিলা প্রশিক্ষণ মাহবিদ্যালয় এবং প্রতি জেলায় একটি করে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অতিসত্ত্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল তা হলো- বর্তমানে বিদ্যালয়ের মহিলা পরিদর্শকের পদটি পরিবর্তন করে নারী শিক্ষার সহকারী পরিচালকের পদে রূপান্তরিত করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক জেলায় মহিলা শিক্ষা অফিসার থাকতে হবে। এই রিপোর্টে দেখা যায় কেবলমাত্র প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ব্যাপারে নারী শিক্ষকের অবস্থান অপেক্ষাকৃত ভালো বলে মনে করা হয়েছে। তবে তার জন্যও সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়নি। নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপারেও কোনো সুপারিশ এতে ছিল না। তবুও এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি।[৪১]

❑ **আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ**

পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যরস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠণ করা হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। এই রিপোর্টটি আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৫৭ নামে পরিচিত। এই কমিশন রিপোর্টে নারী শিক্ষার ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যে সব সুপারিশের উল্লেখ আছে তা নিম্নরূপ ঃ-

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ ঃ

১. প্রত্যেক জেলা শহরে প্রাক-প্রাথমিক স্কুল যেমন-নার্সারী এবং কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. দেশের ছয়টি রেঞ্জে মহিলাদের জন্য ছয়টি পিটিআই প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এগুলোতে বিশেষ কোর্স হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

৪১. ডঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৭-১২৮, ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নার্সারী ও কিন্ডার গার্ডেন শিক্ষা হবে ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪. শহরাঞ্চলের যে সব মহল্লায় অত্যাধিক স্কুল গমন উপযোগী শিশু রয়েছে সে সব মহল্লায় নার্সারী ও কিন্ডার গার্ডেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিধিবদ্ধ দুরত্ব কার্যকর হবে না।

৫. শহরের শিল্প এলাকায় পুরোপুরি ও স্বয়ং সম্পূর্ণ নার্সারী ও কিন্ডার গার্ডেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান, বড় বড় শিল্প কারখানা, পৌর কর্তৃপক্ষ, নার্সারী ও শিশু সনদ স্থাপন করতে হবে। সরকার এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌনঃ পৌনিক খরচ অনুদান হিসেবে প্রদান করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে যতদূর সম্ভব একটি Self-Contained এবং Self- sufficient unit হিসেবে প্রণয়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, এই স্তরের শিক্ষা লাভের মাধ্যমে শিশুরা যেন কার্যকর স্বাক্ষরতাসহ নৈতিক ও নাগরিকত্ব গুণ লাভ করতে পারে এবং অনুশীলনের সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যান্য সুপারিশ সমূহ হলো ঃ-

১. দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. শিক্ষকবৃন্দের বেতন, মর্যাদা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড অতি দ্রুত প্রবর্তন করতে হবে।

৩. মহকুমা পর্যায়ে নিয়মিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. কেন্দ্রিয় সরকারের "সোস্যাল আপলিফট এন্ড ডেভেলপমেন্ট" ফান্ড থেকে বিদ্যালয় গৃহ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে।

৫. উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রত্যেক থানায় একজন করে সাব-ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি, অফিস, একজন কেরানী এবং একজন পিয়ন এর পদ সৃষ্টি করণ এবং সত্বর নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. পিটিআই এর কার্যাদি তত্ত্বাবধানের জন্য ইপিএস ই এস ক্যাডারের একজন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি ও সত্বর নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. মহকুমা পরিদর্শক ও পিটিআই সুপারের পদ সমূহ গেজেটেড পদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

৮. সর্বোচ্চ ১৫ বছর সময়ের মধ্যে ৬-১১ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ের জন্য ফ্রি ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

৯. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা, পাটিগণিত, সমাজ পাঠ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চারু ও কারু কলা, শারীরিক শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষা বিষয় সমূহ অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

১০. ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুদের জন্য একই ধরণের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদেশের সর্বত্র সমানভাবে চালু করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছিল কিন্তু তা পাকিস্তান আমলে বাস্তবায়ন হয়নি। তাছাড়া শিক্ষকদের মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছিল যদি সেগুলো বাস্তবায়ন করা হত তাহলে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় পরিমানগত ও গুণগত মানের লক্ষনীয় পরিবর্তন ঘটত ফলে দেশের সামগ্রিক পরিবর্তন সূচিত হত।[৪২]

---

৪১. ডঃ এম এ ওহাব, আব্দুল গনি সরকার, মনিরা হোসেন- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪০-১৪৫।

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

❑ শরীফ কমিশন রিপোর্টঃ

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের চাহিদা ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য যথাযথ বলে বিবেচিত হয়নি। এ ছাড়া প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা জন সাধারনের আশা-আকাঙ্খা তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সমর্থ নয় এ প্রেক্ষাপটে ১৯৫৮ সালে ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন এস, এম, শরীফ। তাঁর নামানুসারে এটি শরীফ কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন রির্পোটে নারী শিক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ দেখা যায়- যেমনঃ

১। দক্ষ ও কুশলী জনশক্তি,বুদ্ধিমান এবং সংবেদন শীল নাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অপরিহার্য। এ জন্য অন্তত পক্ষে ৮ বছর মেয়াদী স্কুল শিক্ষার প্রয়োজন।

২। দশ বছর সময়ের মধ্যে পাঁচ বছরের বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা এবং সর্বমোট ১৫ বছর সময়ের মধ্যে আট বছরের বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা প্রবর্তনের সাফল্য লাভ চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে।

৩। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের মানসিক গ্রহন ক্ষমতা উপযোগী করে শিক্ষাক্রম প্রনয়ন করতে হবে যাতে পড়া, লেখা ও অঙ্ক চর্চার মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। স্বহস্তে কাজ করার ইচ্ছা ও দেশ প্রেমের মনোভাব জাগ্রত হয়।

৪। সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হবে।

৫। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য স্থানীয় জনসাধারনকে জমি, গৃহ, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষায় বালিকাদের বালকের সমান সুযোগ সুবিধা দেয়া উচিত।

৭। ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন ও স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকাশে মন মেজাজের দিক দিয়ে নারীরাই বেশী উপযোগী। অতএব যোগ্য শিক্ষয়েত্রী পাওয়া গেলে ছোট বালক বালিকাদের প্রথম তিনটি শ্রেনীর শিক্ষার ভার তাদের উপরেই অর্পণ করা কর্তব্য।

৮। প্রত্যেকটি বালিকা স্কুল ও কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ এবং শরীরচর্চা সম্পর্কে ট্রেনিং প্রাপ্ত সুযোগ্য পরিচালিকা থাকতে হবে। পাঠ্য বর্হিভূত কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। প্রাথমিক স্কুলে গার্ল গাইডস (ব্লু-বার্ড), উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে জুনিয়র রেডক্রস এবং গার্ল গাইডস উভয়ই।

উপরোক্ত সুপারিশ সমূহ নিঃসন্দেহে আশা ব্যঞ্জক। তথাপি প্রতিটি সুপারিশের মধ্যে একটা শুন্যতা বা দায়সারা ভাব লক্ষনীয়। যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও সেই শিক্ষক তৈরির ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ রাখা হয়নি। সর্বোপরি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মেয়েদের যে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে এবং সে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র তৈরিতে যে শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে এই কমিশন রির্পোটে তা অবর্তমান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম তিনটি (১ম-৩য় শ্রেণী পর্যন্ত) শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা শিক্ষক নিয়োগদানের সুপারিশ করা হয়েছিল কিন্তু তা করা হয়নি। বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় করনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আমলে শতকরা ৬০ ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে। যদি শরীফ কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হত তবে আজ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষনীয় পরিবর্তন আসত। এছাড়া সুপারিশের ইতি বাচক দিকগুলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রিয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারনে অধিকাংশই বাস্তবতার মুখ দেখেনি।[৪৩]

পাকিস্তান যুগে শিক্ষার অগ্রগতি ও বৈষম্যঃ

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ বিষয়ক একটি চার সদস্যের কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৬৫ সালে কমিশন তার রিপোর্টে স্বীকার করে যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সর্ব ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে ছিল; কিন্তু গত ২০ বছরে অবাস্তব শিক্ষানীতির ফলে সেখানকার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটেছে। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান যে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে তার জন্যে সরকারের এক পেশে নীতিই দায়ী।[৪৪]

পাকিস্তান যুগে শিক্ষার অগ্রগতিঃ ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৫-৬৬

	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
স্তর ও সন	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষার্থী	সরকারী ব্যয়	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষার্থী	সরকারী ব্যয়
			কোটি টাকায়			কোটি টাকায়
প্রাথমিক						
১৯৪৭-৪৮	৩৫,৪৮৪	২৭,১৯৫৩৫	১.২৪	১১,১৯৩	১০,৭৬,২৪৮	২.২৩
১৯৫৬-৫৭	৩২,১৫৪	৩৪,৮৮,২৩০	৪.৩২	২০,৩০৮	২৩,৫৫,৬৫০	৯.৭১
মাধ্যমিক						
১৯৪৭-৪৮	৩,৪৮১	৫,২৬,০২০	০.২৪	২,৫৯৮	৫,০৮,০৩৯	০.৫১
১৯৫৬-৫৭	৩,০৮৪	৪,৯৭,৫৯৯	০.৬৪	২,৬৭২	৮,২৮,৭১৫	২.৪৪
১৯৬৫-৬৬	৪,১০৮	৯,৫৬,২০৬	৫.৩৩	৪,৪৪৩	১৪,৪৯,৪১৭	৬.৭৪
সাধারন কলেজ						
১৯৪৭-৪৮	৫০	১৮,৫৫৬	-	৪০	১৩,৫৫৫	-
১৯৫৬-৫৭	৬৭	২৯,১৫৮	-	৮৫	৪৫,৮৭৮	-
১৯৬৫	১৬১	১,২৫,৫৯৭	-	২২৯	১,৩৪,৩১৯	-
বিশ্ববিদ্যালয়						
১৯৪৭-৪৮	১	১,৬২০	০.১০	২	৬৪৪০.১৯	-
১৯৫৬-৫৭	২	৩,১২৫	০.৫৫	৪	৩,১০৬	১.৪৯
১৯৬৫	২	৬,৭২৯	১.০৯	৪	১০.০৬৮	৫.৬২

৪৩. শামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮-১২০।

৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ১২০-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নানা সুপারিশ থাকলেও নারী শিক্ষার উপর আলাদাভাবে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি।[৪৫]

পাকিস্তান আমলের আদমশুমারী অনুযায়ী এদেশে স্বাক্ষরতার হার ছিল নিম্নরূপঃ

সাল	পুরুষ	মহিলা
১৯৫১	৩৩.৩	১১.০
১৯৬১	২৩.৩	১০.৭

২.১.৭. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ শিক্ষায় নবযাত্রা

১৯৪৭ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশকদের হাত থেকে এই উপমহাদেশের জনগনের রাজনৈতিক মুক্তি ঘটে। এ সময় ভারত ও পাকিস্তান নামে যে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় নতুন রাষ্ট্র হিসেবে তারা উভয়েই ঔপনিবেশিক আমলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে গঠিত বিভিন্ন কমিশন গুলোর সুপারিশ মালা তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি। এছাড়া পাকিস্তান শাসনামলে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে পারে এবং সাথে সাথে বাঙ্গালি জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন কোন শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। তাই ১৯৪৭ সালের পর যতই সময় অতিক্রান্ত হল ততই পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য ক্রমে এত বেড়ে গেল যে, অবশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন জাতি হিসেবে একটি নতুন দেশ বাংলাদেশের অভূদয় ঘটল। স্বাধীনতা লাভ করেই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে অন্য সব ধরনের গঠনমূলক কাজের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের দিকেও মনোনিবেশ করতে হয়।

৪৫. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার, জাহান আরা বেগম- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

❑ ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন-

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে সব কমিশন গঠন করা হয়েছিল বা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যেটুকু কাজ হয়েছিল তার মধ্যে বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির সঠিক প্রতিফলন ছিল না। তাই সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো পূনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সুপারিশ মালা প্রনয়নের কাজে মনোনিবেশ করে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্বতন পাকিস্তান সরকারের অবহেলা জনিত মনোভাবের কারনে যুগোপযোগী ছিল না বলে প্রাথমিক পর্যালোচনায়ই তাতে নানা অসঙ্গতি দেখা গেল। মূলত সে সময়কার এ সমস্ত অভাব, ত্রুটি- বিচ্যুতি দূরীকরন, আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের তৎকালিন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। পরবর্তী কালে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে ৮জুন কমিশন তাদের অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। প্রায় ৪০০জন সদস্য সম্বলিত ৩০টি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির বিস্তৃত কাজের মাধ্যমে এই কমিশন শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুপারিশ প্রনয়ন করেন এবং ১৯৭৪ সালের ৩০মে কমিশন ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন।[৪৬]

কমিশনের রিপোর্ট শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের মৌলিক সুপারিশ ছিল-

প্রাথমিক শিক্ষাঃ সুপারিশ

১। সর্বজনীন শিক্ষা।

২। বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

৩। আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৮৩)।

৪। অতিরিক্ত শিফ্‌ট চালু করা।

৫। মেয়েদের ভর্তির হার বাড়ানো।

৬। অপচয় রোধ করা।

৭। জীবন ভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষা।

শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য প্রধান সুপারিশ ছিল-

☐ শিক্ষার্থীকে সমাজ সচেতন করে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

☐ শিক্ষার্থীর ভিতর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সমবায় ভিত্তিক প্রচেষ্টা ও সৎ নেতৃত্বের চেতনাবোধ জাগাতে হবে।

---

৪৬. ড. এম. এ. ওহাব, আব্দুল গণি সরকার, মনিরা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশ সমূহ হচ্ছে-

- শিশুর নৈতিক মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।
- মাতৃভাষায় লিখন, পঠন ও হিসাবরক্ষনের ক্ষমতা অর্জন, তদুপরি ভবিষৎ নাগরিক হিসেবে যেসব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে সে সবের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতি।
- পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি।

প্রাথমিক পযার্য়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে রিপোর্টের আটাশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

- প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে প্রথম শ্রেনী হতে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত এবং এই পর্যায়ের শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে।
- আবশ্যিক হবে ১৯৮০ সন নাগাদ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত।
- অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা হবে ১৯৮৩ সাল নাগাদ অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত।
- একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাই পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার জন্য আবশ্যিক ভিত্তি ভূমি। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষন করে যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিশুর নৈতিক, দৈহিক, মানসিক এবং ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন ও সর্বতোমুখী বিকাশ যাতে সাধিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- মেয়ে শিশু এবং নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে এবং বাড়াতে হবে এবং বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।
- অধিক হারে মহিলা শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো।
- প্রাথমিক স্তরে শিশুর কর্মমুখী শিক্ষার জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি, শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারু কলা বিষয়ের মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার সমন্বিত রুপরেখা রচনা করা।
- বিদ্যালয়ে ঝড়ে পড়ার হার রোধ করা এবং আকর্ষনীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রনয়ন এবং বিদ্যালয়ে গমনোযোগী সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করা।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সচেতন ও দক্ষ করে তোলা।
- প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন।

যদি ও কমিশনের সব সুপারিশমালা বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। তবে সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছায় ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী করন করে এবং ১,৫৭,৭২৭ জন শিক্ষককে সরকারী চাকুরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর সাংবিধানিক অধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষকগন আর্থ-সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[৪৭]

---

৪৭. এম. এ. ওহাব, আব্দুল গণি সরকার, মনিরা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৩-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন যে শিক্ষা কাঠামো গঠনের সুপারিশ করে তা নিম্নরুপঃ

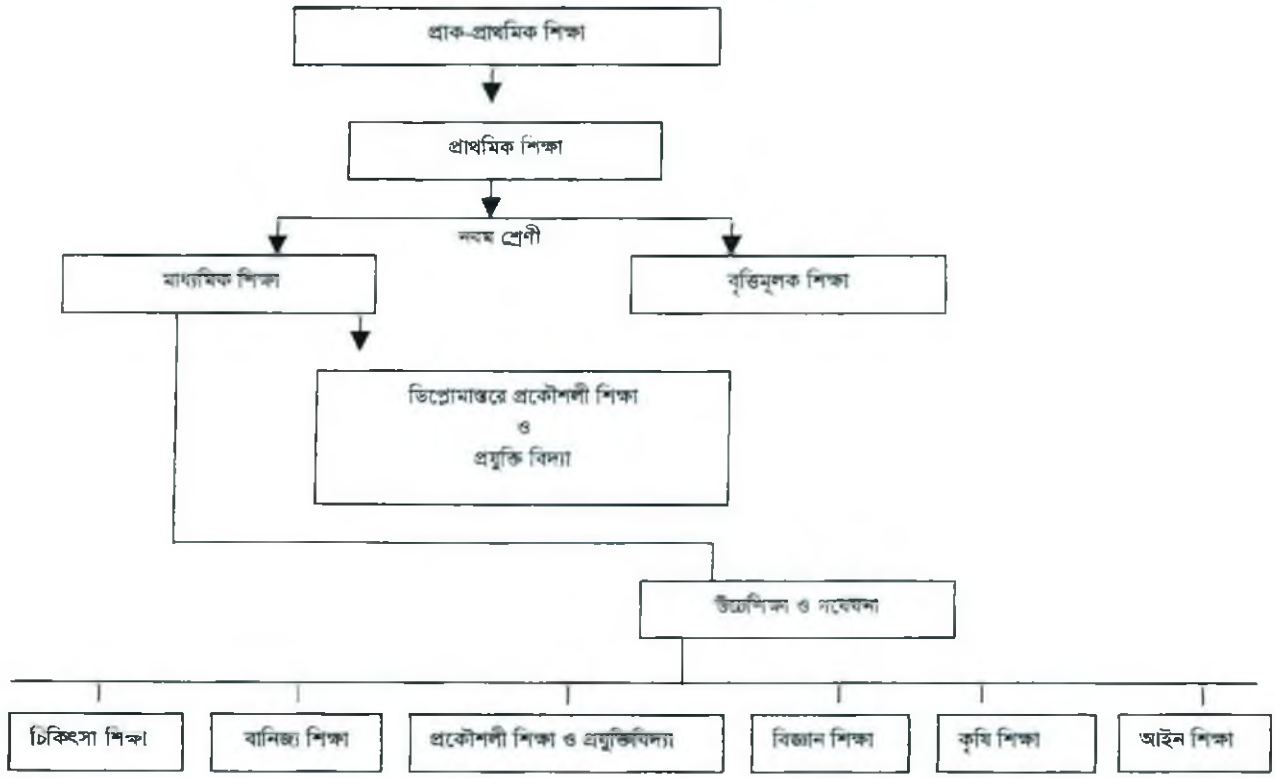

স্বাধীনতার পর এক সমীক্ষায় দেখা যায় বাংলাদেশের বঞ্চিত নারী সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের অনেক পিছনে পড়ে আছে। জাতীয় ভিত্তিতে স্বাক্ষরতার হার ২২.২% শতাংশ বটে, কিন্তু স্বাক্ষর নারীর সংখ্যা মাত্র ১৩.৭% শতাংশ। অপর পক্ষে স্বাক্ষর পুরুষ সংখ্যায় ২৯.৯% শতাংশ (আদমশুমারী ১৯৭৪) পাঁচ ও তদূর্ধ বয়স্ক জনসংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষার হার গণনা করা হয়েছে।

এই বয়ঃ সীমায় জনসংখ্যার ৫২.২% শতাংশ পুরুষ এবং ৪৭.৮% মহিলা, স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত প্রতি ১০৯ জন পুরুষের তুলনায় ১০০ জন মহিলা। কিন্তু পাঁচ ও তদূর্ধ বয়স্ক প্রতি ১০০ জন স্বাক্ষর মহিলার

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় স্বাক্ষর পুরুষের সংখ্যা ২৫০জন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুতেই নারী পুরুষের এই ব্যবধান আত্ম প্রকাশ করে। নিম্নে একটি ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, গত পঁচিশ বছর ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীর চেয়ে বেশী।[৪৮]

প্রাথমিক শ্রেনী সমূহে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা

(হাজারের হিসাবে)

বছর	মোট ভর্তি সংখ্যা	ছেলে	মেয়ে	অনুপাত
১৯৪৯-৫০	২,৫৬৭	১৯৮৩	৫৯৩	৭৭ঃ২৩
১৯৫৪-৫৫	২,৭২৬	২০৩০	৬৯৬	৭৫ঃ২৫
১৯৫৯-৬০	৩,২৭৫	২৪০৩	৮৭২	৭৩ঃ২৭
১৯৬৫-৬৬	৪,১৫৬	২৮৯৯	১২৫৬	৭০ঃ৩০
১৯৭০-৭১	৫,০৭৩	৩৪৫৩	১৬২০	৬৮ঃ৩২
১৯৭২-৭৩	৭,৮৫৩	৫০৭৭	২৭৫৮	৬৫ঃ৩৫
১৯৭৩-৭৪	৭,৮৭৯	৫২৭৬	২৬০৩	৬৭ঃ৩৩
১৯৭৪-৭৫	৮,৫৩০	৫২৬৪	২৯০৬	৬৬ঃ৩৪

টীকাঃ প্রাথমিক শ্রেনীতে ভর্তি সংখ্যা দেয়া হয়েছে। কারন কতিপয় মাধ্যমিক স্কুলে প্রাথমিক বিভাগ আছে।

৪৮. মাহমুদা ইসলাম, নারী শিক্ষা- বাংলাদেশের বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা, মনোয়ারা হোসেন (অনূদিত) উইমেন ফর উইমেনঃ গবেষনা ও পাঠ চক্র (প্রকাশনায়), পৃষ্ঠা- ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ছয় থেকে দশ বছর বয়ঃ সীমাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহনের কাল চিহ্নিত করেছেন। নিম্নের ছকে ১৯৭৪ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ৬-১০ বয়ঃ সীমায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা দেয়া হয়েছে।

১৯৭৪ সালে ৬ থেকে ১০ বছর বয়ঃ সীমায় বালক বালিকার বন্টন (হাজারের হিসাবে)

১৯৭৪ সনে বালক/বালিকার সংখ্যা					১৯৭৪-৭৫ সালে প্রাথমিক শ্রেনী গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত
বয়স	মোট	বালক	বালিকা	অনুপাত	
৬	২,৬১৮	১,৩২১	১,২৯৬		
৭	২,৬০৯	১,২৮৫	১,৩২৮		
৮	৩,০৫৫	১,৫৬৩	১,৪৯২		
৯	১,৭৮৭	৮৮৬	৯০১		
১০	৩,০২৮	১,৬২৪	১,৪০০		
৬-১০	**১৩,০৯৩**	**৬,৬৭৯**	**৬,৪১৩**	**৫১:৪৯**	**৬৬:৩৪**

এই ছকে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অনগ্রসরতা যে চিত্র পাওয়া যায় তা দেখে বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। ১৯৭৪ সালে যে সব ছেলে মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহনের উপযুক্ত বয়ঃ সীমায় ছিল অথাৎ যাদের বয়স ছিল ছয় থেকে দশ বছরের মধ্যে, তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৪৯% শতাংশ। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষা বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র ও ছাত্রীর, মধ্যে মাত্র ৩৪% শতাংশ ছিল মেয়ে। নিম্নে প্রদত্ত ছকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহনের উপযুক্ত বয়সের মেয়েদের মধ্যে ৫০% শতাংশের ও কম সংখ্যক বালিকা ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিল।[৪৯]

১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ছাত্রীর অনুপাত (হাজারের হিসাবে)

	বালক			বালিকা		
বয়ঃ সীমা	১৯৭৪ সালে মোট বালকের সংখ্যা	১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংখ্যা	বালকের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার অনুপাত	১৯৭৪ সালে মোট বালিকার সংখ্যা	১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংখ্যা	বালিকার সংখ্যা ও ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত
৬-১০	৬,৬৭৯	৫,২৬৪	৮৪%	৬,৪১৩	২,৯০৬	৪৫%

উৎস ঃ ১ম ও ২য় ছক থেকে সংগৃহীত।

৪৯. মাহমুদা ইসলাম, মনোয়ারা হোসেন (অনূদিত), পৃষ্ঠা- ৪২-৪৩, ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া একটি সমীক্ষায় দেখা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী দু'বছর বিভিন্ন শ্রেনীতে ভর্তি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা পর্যালোচনায় বেরিয়ে আসে যে উপরের শ্রেনী গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা নীচের শ্রেনী গুলোর চেয়ে কম। প্রায় ৫০% শতাংশ ছেলে মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেনীতে উঠে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। তবে স্কুল ত্যাগের হার ছাত্রীদের মধ্যে বেশী। পঞ্চম শ্রেনীতে অধ্যয়নরত বালক ও বালিকার অনুপাত ছিল ১৯৭২-৭৩ সালে ৭৯ঃ২১ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ৭১ঃ২৯। অপর পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলো শ্রেনীতে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বালক ও বালিকার অনুপাত যথাক্রমে ৬৫ঃ৩৫ এবং ৬৭ঃ৩৩। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগের অধিকতর প্রবনতার দরুন ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে সংখ্যার অসমতা উপরের শ্রেনী গুলোতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং অতি স্বল্প সংখ্যক ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।[৫০]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও অধ্যয়ন (হাজারের হিসাবে)

শ্রেনী	১৯৭২-৭৩		১৯৭৩-৭৪	
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
১ম	২৩৪১	১২৬৪	২০৮১	১২২৩
২য়	৯৪৬	৫৮৪	১১৩৫	৫৭৬
৩য়	৭৪৯	৩৮২	৯৪৭	৩০৭
৪র্থ	৬০২	২৬১	৬১১	২৮৩
৫র্ম	৪৫৯	২০৪	৫০২	২১০

যে সকল বালক প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ১০% শতাংশ ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দশম শ্রেনী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে। কিন্তু যে সব মেয়ে প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে মাত্র ৩% শতাংশ ছাত্রী মাধ্যমিক স্কুলে প্রবেশ করে দশম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাত মাত্র ১৬ঃ৮৪। নিচের ছকে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার শুরুতে নারী ও পুরুষে যে বৈষম্য দেখা দেয় শিক্ষার উচ্চতর ধাপ গুলোতে সে বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।[৫১]

৫০. মাহমুদা ইসলাম, মনোয়ারা হোসেন (অনূদিত), পৃষ্ঠা- ৪৩-৪৪।

৫১. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ছাত্রীর বন্টন

শিক্ষার স্তর	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	অনুপাত
প্রাথমিক	৫২,৭৫,৮৩৪	২৬,০৩,৬১৯	৬৭ঃ৩৩
মাধ্যমিক	১২,২৮,১৫৯	২,৯১,৬৬৬	৮০ঃ২০
বিশ্ববিদ্যালয়	২৫,২৪৬	৪,৭২০	৮৫ঃ১৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৫ ইয়ার বুক।

উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরন ও সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহন করেন। ফলে একদিকে যেমন মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে মেয়ে ও ছেলে শিশুদের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস পেতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় মেয়ে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। মেয়ে শিশুদের শিক্ষা তথা নারী শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সম্প্রসারিত দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহনে বিশ্বব্যাপী ঐক্যমত সৃষ্টিতে যে সকল মুষ্টিমেয় দেশ অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে -- বাংলাদেশ তাদের অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাঃ বর্তমানে পরিপ্রেক্ষিত

প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার মুলভিত্তি এবং এ ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী স্তরের শিক্ষা এবং শিক্ষা জীবন। শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখার উন্নতিকল্পে আমরা যত অর্থই ব্যয় এবং যত শ্রমই দেই না কেন সবই বিফলে যাবে যদি না প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব হয়। কেননা এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মন নরম কাঁদা মাটির মতো থাকে। এ কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এ সময়ে যা কিছু জানবে ও শিখবে তাই তাদের সমগ্র জীবন ভর প্রভাবিত করবে। এছাড়া শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই পৃথিবীর সব দেশে সমভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়।

৩.১ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোঃ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো স্পষ্ট ভাবে অনুধাবনের জন্য দেশের শিক্ষার স্তরগুলো জানা দরকার। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর স্তরগুলো নিম্নরূপঃ

১। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
২। প্রাথমিক শিক্ষা
৩। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা
৪। মাধ্যমিক শিক্ষা
৫। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
৬। উচ্চ শিক্ষা

উল্লেখিত স্তর গুলো সাধারণ শিক্ষার। এগুলোর পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর রয়েছে। (শিক্ষা কাঠামোর চিত্রে তা দ্রষ্টব্য) বাংলাদেশের বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দুইভাবে পরিচালিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার শুরুর প্রথম বছর থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় এবং ১৬ বছর নিয়মিত পাঠক্রম চালানোর পর তা শেষ হয়।[১]

---

১. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহিউদ্দিন, প্রফেসার মুঃ রিয়াজুল ইসলাম (সম্পাদনায়), প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মুদ্রন কালঃ এপ্রিল-২০০২, পৃষ্ঠা-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো

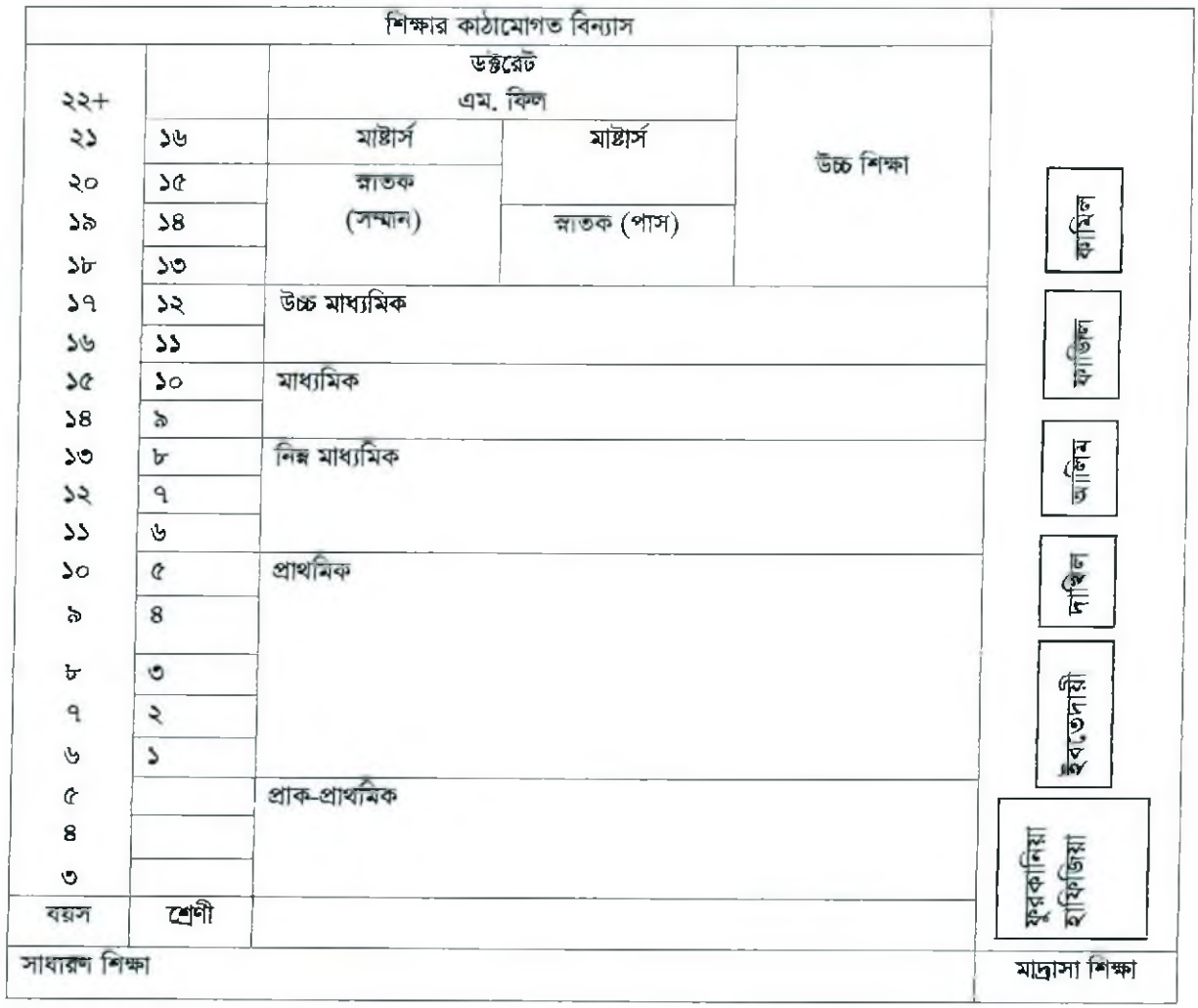

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা একটি আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭৮,১২৬ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়, সময়কাল এবং শিক্ষার্থীর বয়স ভিত্তিক চার্ট নিম্নে দেয়া হলোঃ[২]

সাধারন শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ঃ

শিক্ষা স্তর ও শ্রেণী	শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণী	বিদ্যালয়	শিক্ষার ধরন
১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	৪ + থেকে ৫ + বছর বয়স	নাসারী/কিন্ডার গার্টেন/প্রাথমিক বিদ্যালয় -শিশু শ্রেণী	বাধ্যতামূলক নয়। সরকারী পর্যায়ে অবৈতনিক/বেসরকারী পর্যায়ে বৈতনিক।
২. প্রাথমিক শিক্ষা	৬ + থেকে ১১ + বছর বয়স (I-V)	প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক শাখা	বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক/বেসরকারী পর্যায়ে বৈতনিক।
৩. নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা	১১ + থেকে ১৩ + বছর (VI-VIII)	মাধ্যমিক স্কুল সংলগ্ন/পৃথক কলেজ/ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন	বাধ্যতামূলক নয়। বৈতনিক
৪. মাধ্যমিক শিক্ষা	১৪ + থেকে ১৫ + বছর (IX-X)	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বাধ্যতামূলক নয়। বৈতনিক।
৫. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	১৬ + থেকে ১৭ + বছর (XI- XII)	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বাধ্যতামূলক নয়। বৈতনিক
৬. উচ্চ শিক্ষা	১৮ + ও তদুর্ধ বছর	ডিগ্রীকলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/ ইনষ্টিটিউট	বাধ্যতামূল নয়। বৈতনিক

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা কাঠামো অনুসারে প্রাথমিক স্তর পাঁচ বছর, মাধ্যমিক স্তর পাঁচ বছর, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর দুই বছর, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ডিগ্রীর মেয়াদ দুই বা বা তিন বা চার বছর এবং দ্বিতীয় ডিগ্রীর মেয়াদ এক বা দুই বছর। একই সমান্তরালের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, যেমন- এবতেদায়ী ৫ বছর, দাখিল- ৫ বছর, আলিম ২ বছর, ফাজিল ২ বছর এবং কামিল ২ বছরের কোর্স যা মুসলিম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এছাড়া হিন্দু ধর্মের সংস্কৃত টোল এবং পালিটোলস বৌদ্ধদের জন্য রয়েছে।[৩]

---

২. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মঈ উদ্দিন, প্রফেসার মুঃ রিয়াজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯।

৩. Directorate of Primary Education,- Primary Education statistics in Bangladesh-2001. Primary and Mass Education Division, Government of the peoples Republic of Bangladesh, May-2002, Page-2

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

প্রাথমিক ও গনশিক্ষা বিভাগের অধীনে চার ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে-[৪]

১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

২। পি. টি. আই সংলগ্ন পরীক্ষন বিদ্যালয়

৩। রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

৪। কমিউনিটি বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা একটি আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭৮,১২৬ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা নিম্নে ছকে প্রদান করা হলোঃ[৫]

বিভিন্ন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ ২০০১

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭১
পি,টি আই সংলগ্ন পরীক্ষন বিদ্যালয়	৫৩
রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯,৪২৮
কমিউনিটি বিদ্যালয়	৩,২৬৮
স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	৪,০৯৫
উচচ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৭৬
আন- রেজিষ্টার্ড বেসরকারী বিদ্যালয়	১,৯৭১
কিন্ডার গার্টেন	২,৪৭৭
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৩,৮৪৩
হাই মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৩,৫৭৪
এন জি ও পরিচালিত স্কুল	১৭০
মোট	৭৮,১২৬

৪. Directorate of Primary Education,- Primary Education statistics in Bangladesh-2001. Primary and Mass Education Division, Government of the peoples Republic of Bangladesh, May-2002, Page-3

৫. ঐ, Page-4

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষাঃ শিশু জন্মগত অধিকার

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতীয় সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি তথা জাতীয় অগ্রগতি কেবল মাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। তাছাড়া যে কোন জাতিকে সামাজিক ভাবে সচেতন করে, তাকে সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশুর জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং তার দৃষ্টি ভঙ্গি ও আচরনের পরিবর্তন ঘটে। জন্মের পর থেকেই মানুষের শিক্ষা শুরু হয় তার পরিপূর্ন বিকাশের জন্য। বিকাশের দৃষ্টিকোন থেকে শৈশব শিক্ষা ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা আন্তর্জাতিক ভাবে মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৯২৪ সালের জেনেভার ঘোষনায় শিশুদের শিক্ষার অধিকার এর কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারন সম্মেলনে মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষার মৌলিক ও প্রাথমিক স্তর হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। কারিগরী বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য প্রাপ্তি সাধ্য করতে হবে এবং উচ্চ শিক্ষা মেধানুসারে সমভাবে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে ১৯৫৯ সালের ২০ ডিসেম্বর শিশুর অধিকার বিষয়ে ১০টি নীতি গ্রহন করা হয়। এই নীতি সমূহের ৭নং নীতিতে বলা হয়েছে শিশু খেলাধুলা ও বিনোদন এবং স্বার্থ রক্ষার উপযোগী নির্দেশনা সহ শিক্ষা বিশেষত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার ভোগ করবে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হওয়ার মধ্যদিয়ে সমগ্র বিশ্বের শিশুর মৌলিক শিক্ষার অধিকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। এ সনদে বিশ্বের শত কোটি শিশুর আশা আকাঙ্খাই প্রতিফলিত হয়েছে।

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ যাবৎ কালে নেয়া সনদগুলোর মধ্যে শিশু অধিকার সনদকে সবচেয়ে প্রগতিশীল, বিশদ ও সুনির্দিষ্ট মানবাধিকার চুক্তি বলে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। ৫৪ টি অনুচ্ছেদের এ সনদে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে সুরক্ষার অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহনের ও অংশ গ্রহনের অধিকার, মানবিক ও মানসিক উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করণার্থে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এই সনদের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শরীক রাষ্ট্র সমূহ শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করে সকলের জন্য সমান সুযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা খরচে লাভের সুযোগ করে দেবে। সনদের ২৯ অনুচ্ছেদে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য বিধৃত হয়েছে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) সনদে শিক্ষাই শিশুদের জন্য একমাত্র স্বীকৃত কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য সকল প্রকার শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং শিশুর শিক্ষা তার জন্য কোন বাড়তি সুযোগ বা কারো অনুগ্রহ না বরং এটি তার মৌলিক অধিকার। এ কথা আজ বিশ্বজনীন সত্য। তাই পৃথিবীর সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

---

৬. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ জিয়াউল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১-২।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ঃ

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বঃ আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষার এই প্রাবম্ভিক স্তরকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার মৌল ভিত্তি এ স্তরেই রচিত হয়। সাধারনভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের একটি হচ্ছে শিক্ষার মৌল ভিত্তি হিসেবে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ, অন্যটি হচ্ছে পরবর্তী শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি। বাংলাদেশের এক বিরাট সংখ্যক শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই প্রারম্ভিক শিক্ষা।

* প্রাথমিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক। আমাদের দেশে সাধারনত প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুর বয়স ৬ (+) -১১ বছর পর্যন্ত থাকে। বয়স ভেদে শিশুর মাঝে চাহিদার যে তারতম্য দেখা যায় তা শিশুর সুষ্ঠু পরিপূর্ন সার্বিক বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ বিকাশ নানাবিধ হতে পারে। যেমন- শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি-বৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয়। তাই বলা হয়ে থাকে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা এবং শিক্ষা জীবন।

* আজকের শিশু আগামী দিনের সমাজ গঠনের কর্মী। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরেই শিশুর মনের গণতান্ত্রিক চেতনার অংকুর উপ্ত করা গেলে তা পরবর্তী জীবনে মহীরুপে পরিনত হয়ে ব্যক্তি মানসে দৃঢ় গণতান্ত্রিক বোধ জাগ্রত করে।

* শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষা। শিশু যে অমিত সম্ভাবনা ও প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহন করে তার স্ফুরন ঘটানোর দায়িত্ব বর্তায় প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর। কেননা এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মন নরম কাঁদা মাটির মতো থাকে। এ কোমল মতি শিক্ষার্থীরা এ সময়ে যা কিছু জানবে ও শিখবে তাই তাদের সমগ্র জীবন ভর প্রভাবিত করবে। একটি ছোট চারাগাছ যেমন সঠিক পরিচর্যার দ্বারা একদিন মহীরূহে পরিনত হয় তেমনি শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে শিক্ষকের সযত্ন সহায়তা, আনুকূল্য ও যথাযথ নিদের্শনায় তা বিকাশ লাভ করে শিশুর জীবনে সাফল্য বয়ে আনে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হবে বাগানের মালীর ন্যায়। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর পরম বন্ধু, বিজ্ঞ পবিচালক ও উত্তম পরামর্শদাতা।

* শিশুর মধ্যে লুকায়িত প্রতিভা বা সম্ভাবনা বহুমূখী। সকল শিশু একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম গ্রহন করেনা। তাই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শুধু পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষাক্রমে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংগীত, চারুকারু, ও শারিরীক শিক্ষা। এতে শিশুরা অল্প বয়স থেকেই তার প্রতিভার প্রমান রাখতে পারে।

* শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে, কর্ম জীবনে সাফল্য বয়ে আনতে শিক্ষার মৌল ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, মানবাধিকার সচেতনতা, সহজ জীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ, অধ্যাবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুনাবলী অর্জনে সহায়তা করা।

- সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং অর্থপূর্ন শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে শিশুকে তা জীবন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করা।

- শিশুকে জীবন যাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরনে সমর্থ করা। মূলতঃ মৌলিক শিখণ চাহিদার নিরিখেই মৌলিক শিক্ষার রুপরেখা প্রনীত হয়। সাক্ষরতা, বাচনিক প্রকাশ ক্ষমতা, গানিতিক দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এ চারটি যোগ্যতা শিখনের আবশ্যকীয় বিষয়াবলী। আর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী এ চারটি গুনের বিকাশই হল মৌলিক শিখনের বিষয়বস্তু (Basic Learning Content)। সুতরাং শিখনের আবশ্যকীয় যোগ্যতা গুলো অর্জন এবং প্রয়োজনীয় গুনাবলীর বিকাশ সাধনাই হল মানুষের মৌলিক শিখন চাহিদা। কোন শিক্ষা এ চাহিদা গুলো পূরন করতে ব্যর্থ হলে সেই শিক্ষা কল্যাণকর ও জীবনের মানোন্নয়ের সহায়ক হয় না। শিক্ষার ভিত্তি গড়তে ও ব্যর্থ হয়। অতএব মৌলিক শিখন চাহিদা হল মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গুনাবলীর বিকাশ সাধন, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন মানের উন্নতি বিধান, তথ্যপূর্ন সিদ্ধান্ত এবং অবিরত শিখনের নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে জীবনের চাহিদা পূরন। এই শিখন চাহিদার নিরিখেই বিস্তৃত পটভূমিতে সংগঠিত হয় মৌলিক শিক্ষা, সঙ্গত অর্থেই এই শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষা যা পরবর্তী শিক্ষা অর্জনেব মূলভিত্তি । তবে শিক্ষার মৌল ভিত্তি হিসেবে ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তি গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য ৮ বছরের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০০০ এ যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর তাই প্রাথমিক শিক্ষার মতই প্রসার ঘটবে, ততই জাতি নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। পৃথিবীর সব দেশে তাই সমভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়।[৭]

৭. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১-২০।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীঃ

আজকের শিশুই আগামী দিনের সফল মানুষ। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে কোন না কোন দিকে সাফল্য অর্জনের গুনাগুন দিয়ে সৃষ্টি করেন। এই গুনাগুনগুলোর পরিপুষ্টি সাধনের উপরই তার জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। প্রত্যেক শিশুই কত গুলো জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম গ্রহন করে। এই সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে যদি না তা বিকশিত হবার কোন পরিবেশ পায়। শিশুর মধ্যকার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা শিক্ষার কাজ। শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক হার্বার্ট এর মতে শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের বহুমূখী প্রতিভা ও অনুরাগের সুষম প্রকাশ। অপরদিকে ফ্রেঙ্কি পার্কার এর মতে, মানুষের সকল সম্ভাবনার পরিপূর্ন বিকাশ সাধনই হচ্ছে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরুপঃ

প্রথমতঃ শিশুর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

দ্বিতীয়তঃ শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরন এবং দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

তৃতীয়তঃ শিশুর মাঝে অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার, কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, ন্যায়-নিষ্ঠা ইত্যাদি গুনাবলী জাগ্রত করা।

চতুর্থতঃ মাতৃভাষার লিখন, পঠন ও হিসাব রক্ষনের ক্ষমতা অর্জন।

পঞ্চমতঃ মানুষে মানুষে মৈত্রী, প্রীতি ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা।

ষষ্ঠতঃ শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

সপ্তমতঃ কর্মমূখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

অষ্টমতঃ দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলা।

নবমতঃ জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।

দশমতঃ প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা।

এ সব উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাথীদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।[৮]

---

৮. জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, মুহাম্মদ ইবনে ইসাম- শিক্ষার ইতিহাস, ডঃ মোঃ গোলাম রসুল মিয়া (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় অঙ্গীকার ও সাংবিধানিক অধিকার ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর অধিকার। শিশুর এই অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে বার বার কিন্তু অভাব ছিল এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট বা সুপরিকল্পিত উদ্যোগের। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিহাসে তারই প্রমান মেলে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রথমবারের মত গনমানুষের মুক্তিমন্ত্র হিসেবে শিক্ষার চাহিদাও মূর্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ সরকার নিজ দায়বদ্ধতায় সকল নাগরিককে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাদানে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ নং অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষা মানুষেব অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

রাষ্ট্রঃ

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।

খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ন করবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি কেমন হবে তা এই অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে বলা হয়েছে। শিক্ষা হবে-

ক) একই পদ্ধতিরঃ ধনীদের জন্য এরকম এবং দরিদ্রের জন্য অন্যরকম এই রূপ নয়। এক ধর্মের লোকদের জন্য এক রকম, অন্য ধর্মের লোকদের জন্য অন্যরকম এই রূপ নয়, শিক্ষাক্রম ভিন্ন নয় একই প্রকারের। সকল বিদ্যায়তনে একই সুযোগ-সুবিধা ও উপকরনের সমতা রক্ষা প্রভৃতি এই নীতির অন্তর্গত।

খ) গণমূখীঃ যে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য জনগন, সেটাই গনমূখী শিক্ষা। মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য উচ্চ ব্যয় সম্পন্ন বিলাস বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা গনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপন্থী। নগর অঞ্চলের শিক্ষা এবং পল্লী শিক্ষার প্রতি সমান মনোযোগ প্রদান এই নীতির অন্তর্ভূক্ত।

গ) সর্বজনীনঃ যে শিক্ষা সকল প্রকার ভাবধারাকে গ্রহন করতে পারে, তাই সর্বজনীন শিক্ষা। এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা বা বিশেষ ধর্মভিত্তিক বা বাদভিত্তিক শিক্ষা সর্বজনীন নয়, সকল মানুষের জন্য যে শিক্ষা তাই সর্বজনীন।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) একটা বিশেষ স্তর পর্যন্তঃ আইনের দ্বারা একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করুন।

ঙ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্নঃ জীবনের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ন প্রয়োজন ও সমস্যার যথার্থ সমাধানের প্রতি শিক্ষা পদ্ধতি নিবেদিত হওয়া উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তনশীল সমাজের দাবী ও আশা আকাঙ্খা সমূহের যথার্থ বিন্যাস হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চ) নিরক্ষরতা দূবীকরনঃ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষবতা দূর করতে হবে।

সংবিধানের আর যে দুটি অনুচ্ছেদ শিশুদের নীতি ঘোষনা কবেছে, সে দুটি সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অংশ। এই ভাগে মৌলিক অধিকার সমূহ বিধৃত। ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রে কোন বৈষম্য দেখাবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে কোন নাগরিক বৈষম্যের শিকার না হয় সেই জন্য এই রক্ষাকবচ। কিন্তু শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রনয়ন করায় রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে। বয়সের কারনে শিশু শ্রেণী স্বভাবতই দুর্বল। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আইনসিদ্ধ। চৌত্রিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সকল প্রকারের জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ। শিশুদের তাই জোর করে কাজ করানো আইনসিদ্ধ নয়।[৯]

৯. লুৎফর রহমান খান এবং এ, এইচ, এম, মহিউদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ প্রাথমিক শিক্ষাঃ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও কর্মসূচী

ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। পৃথিবীর সব মানুষ আজ এক পরিবার ভূক্ত। বিশ্বজনীন বোধে তাড়িত হয়ে দুনিয়ার সকল শিশুর কল্যাণে সকল শিশুর নূন্যতম মৌলিক শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানে সদস্য রাষ্ট্র সমূহের অংগীকার আদায় ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রনয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঙ্ঘ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বেশ কয়েকটি সম্মেলন। এ সব সম্মেলনে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষিত হয় শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারের কথা। ইউনেস্কো Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) নামে এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছেঃ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে স্বাক্ষরতার বিস্তার, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও চলমান শিক্ষার সম্প্রসারন। নিরক্ষরতা দূরীকরন আর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অঙ্গা অঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। বয়স্ক শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষিত করে তোলার মানে হবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী রূপায়নে বড় রকমের সাহায্য করা এবং পক্ষান্তরে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, যদি অর্জিত হয়, তা নিরক্ষরতা দূরীকরণকে ত্বরান্বিত করবে। চলমান শিক্ষা নব্য শিক্ষিতদের পুনরায় অশিক্ষিত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাক্ষরতা ও চলমান শিক্ষা ইউনেস্কোর অচচউঅখ কর্মসূচীর অন্তর্গত। ইউনেস্কোর এ কর্মসূচী এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সদস্য দেশগুলোতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাক্ষরতা ও চলমান শিক্ষার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য দিয়ে আসছে।

❑ করাচী সিদ্ধান্তঃ

১৯৬০ সালে সর্ব প্রথম ইউনেস্কোর উদ্যোগে পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। করাচী সিদ্ধান্তে বলা হয়- ১৯৬০ সনের পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রত্যেকটি দেশ কমপক্ষে ৭ বছর মেয়াদী সর্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে।

❑ তেহরান সিদ্ধান্ত ঃ

ইউনেস্কো শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইরানের রাজধানী তেহরানে ১৯৬৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে পৃথিবীর ৮৯ টি দেশের শিক্ষা মন্ত্রীরা যোগদান করেন। তখন থেকে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

❑ **ব্যাংকক সিদ্ধান্ত ঃ**

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের ৪-১১ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত "Ministers of Education and those Responsible for Economic Planning in Asia and Pacific" সম্মেলনে এতদঞ্চলের দেশগুলোতে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

❑ **বিশ্ব শিশু সম্মেলনঃ**

১৯৯০ সনের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার নিউইর্য়কে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শিশু সম্মেলন। এ সম্মেলনে ঘোষিত হয় শিশুদের বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিশ্ব ঘোষনা এ সম্মেলনে শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক নিরক্ষরতা হ্রাসকরণ, মেয়ে ছেলে নির্বিশেষে সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা এবং ২০০০ সালের মধ্যে অন্ততঃ ৮০% শিশুর প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ন করার লক্ষ্য নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ এ ঘোষনার অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সনে গৃহীত শিশু অধিকার সনদ অনুমোদনকারী প্রথম ২২ দেশের একটি বাংলাদেশ।

ডাকার ঘোষনায় ঘোষিত ৬টি লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি দেশে একটি "জাতীয় সবার জন্য শিক্ষা (ই এফ এ) কমিটি" গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিটি সম্মেলনে গৃহীত ৬টি লক্ষ্য অর্জনে একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে ও তা বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি কমিটি লক্ষ্য বাস্তবায়নে অর্জিত গতি ও তার বাধা সমূহ নিরীক্ষন করে তা দূর করার পদক্ষেপ নেবে। কমিটিকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও অংশ গ্রহণমূলক করার জন্য এতে সমাজের সকল শ্রেনী র ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ২০০২ সালের মধ্যে কর্মপরিকল্পনাটি করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ডাকার ঘোষনা বাস্ত বায়নের জন্য ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে।

❑ **জমতিয়েন সম্মেলনঃ**

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন যা জমতিয়েন সম্মেলন নামে পরিচিত। থাইল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর জমতিয়েনে ৫-৯ মার্চ, ১৯৯০ পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় এ সম্মেলন। বিশ্ব ব্যাংক ইউ এন ডিপি, ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে ৯-১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সনে ঢাকায় দক্ষিন ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলের শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত মোট নয়টি আঞ্চলিক সম্মেলনের মধ্যে এটি ছিল একটি। জমতিয়েনের এ বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দেশের সরকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানসহ ১৫০ টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। এ ধরনের সম্মেলন এটাই প্রথম। বিশ্বের সব অঞ্চলের প্রতিনিধিদের অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ হয়ে ঘোষিত হয় সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব ঘোষনা (World Declaration on Education for All) । সবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই ঘোষনার মূল কথা-

১. সকলের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরনঃ মৌলিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত সুযোগ থেকে প্রত্যেক শিশু, যুবক, বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে।

২. দৃষ্টিভঙ্গী গঠনঃ সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষার প্রতি সমর্থন পুর্নব্যক্ত করাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান সর্বোত্তম ব্যবস্থাদির ভিত্তিতে দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করতে হবে যেন বর্তমান সম্পদ সীমা, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অতিক্রম করে সকলের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা যায়।

৩. সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সমতার বিস্তৃতিঃ সকল শিশু, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিকে মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে।

৪. শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদানঃ শিক্ষার সম্প্রসারিত সুযোগ কোন ব্যক্তি বা সমাজের অর্থবহ উন্নয়নের কাজে লাগে কিনা তা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে ঐ ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোন শিক্ষা অর্জন করে কিনা তার উপর- অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, যুক্তি, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যদি আত্মীকরন করা যায় তবেই শিক্ষা উন্নয়নের কাজে লাগে।

৫. মৌলিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিধি বিস্তৃত করণঃ শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি সকলের মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনের বৈচিত্র্য, জটিলতা, এবং পরিবর্তনশীলতার কারণে মৌলিক শিক্ষার সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে তার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। এর মধ্যে আছে-

- ∇ নবজাতকের যত্ন এবং শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা
- ∇ প্রাথমিক শিক্ষা
- ∇ যুবা ও বয়স্কদের বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বিভিন্ন মুখী শিক্ষা।
- ∇ তথ্য বিনিময়ের সকল কৌশল ও মাধ্যম ব্যবহার করে জনসাধারনকে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান দান এবং তাদেরকে সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত করা ও শিক্ষিত করা।

৬. শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণঃ সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা লাভ হয় না। যাদের জন্য শিক্ষার আয়োজন তারা যেন শিক্ষার কর্মকান্ডে শরিক হবার জন্য এবং সে কর্মকান্ড থেকে উপকৃত হবার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, শারীরিক ও আবেগিক সমর্থন পেতে পারে সমাজকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করণঃ জাতীয় আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা আয়োজনের যে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় সে দায়িত্ব পালনে কোন কর্তৃপক্ষ এককভাবে লোকবল, সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দিতে সক্ষম হবে এমন আশা করা যায় না। সে জন্যই সকল স্তরে নতুন উদ্যোগে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮. প্রাসাঙ্গিক সমর্থক নীতিমালা গঠনঃ ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নেব লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তার সদ্ব্যবহার করার জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমর্থক নীতিমালা গঠন করা প্রয়োজন।

৯. সম্পদ সংগ্রহঃ অতীতের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃততর আকারে সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষার আয়োজন করতে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকারী , বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডে অধিকতর অর্থ সম্পদ ও মানব সম্পদ যোগানো অপরিহার্য।

১০. আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়করণঃ মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটানো সকলের ও বিশ্বের মানবিক দায়িত্ব। যেহেতু বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকারকল্পে ন্যায্য, নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আন্তর্জার্তিক সম্পর্ক দৃঢ় করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিশ্ব সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০০০ সালের জন্য নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো স্থির করা-

∇ প্রাথমিক শিক্ষাঃ প্রত্যেকটি সংশিষ্ট দেশ তাদের জাতীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কমপক্ষে ১৪ বছর বয়সের ৮০% শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

∇ বয়স্ক শিক্ষাঃ সবার জন্য মৌলিক দক্ষতা ও জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা।

∇ সাক্ষরতাঃ নিরক্ষরতার হার ব্যাপক হারে কমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের লক্ষ্য স্থির করা।

বাংলাদেশ এ সম্মেলনে ২০০০ সনের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন করে।

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীঃ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ এবং সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও নির্দেশ প্রতিপালনে সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে। কর্ম পরিকল্পনার তিনটি প্রধান অংশ-

∇ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা।

∇ উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা।

∇ অবিরত শিক্ষাসহ গণশিক্ষা।

১৯৯৩ সনে ১৪-১৬ ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সহ ৯টি অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশের সম্মেলন। এ সম্মেলনের ঘোষনা পত্রে ও ২০০০ সনের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরনসহ সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

❑ **ডাকার বিশ্ব সম্মেলনঃ**

২০০০ সালের এপ্রিলে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত বহু সংগঠন সবার জন্য শিক্ষা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সম্মেলন শেষে ঘোষনাপত্রে সকলেই নিচের ছয়টি লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকাববদ্ধ হয়ে স্বাক্ষর করেন। লক্ষ্য গুলো হলোঃ

∇ সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু সহ সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন।

∇ নারী, শিশু সংখ্যালঘু বংশোদ্ভুত শিশু ও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার এমন ধরনের শিশুসহ সকল শিশুর জন্য ২০০৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে, বাধ্যতামূলক, মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহন।

Dhaka University Institutional Repository

∇ সকল শিশু -কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা চাহিদা নিশ্চিতকরণ এবং তা নিশ্চিত করতে বুনিয়াদী, জীবন ঘনিষ্ঠ ও সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করা যার ফলে সেখানে সকলের সমান অভিগমন নিশ্চিত হয়।

∇ ২০১৫ সালের মধ্যে বিশেষতঃ নারী সহ সকল বয়স্ক সাক্ষরতা হার অন্ততঃ ৫০ ভাগে উন্নীত করণ এবং বুনিয়াদী ও তৎপরবর্তী শিক্ষায় বয়স্কদের অংশগ্রহনের প্রাথমিক সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

∇ ২০০৫ সারের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যমান সকল লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ২০১৫ সালের মধ্যে লিঙ্গীয় সাম্যঅর্জন এ সীমা অর্জন করতে গিয়ে সকল নারীর জন্য মান সম্পন্ন বুনিয়াদী শিক্ষায় পূর্ন ও সূষম প্রাথমিক প্রবেশধিকার নিশ্চিত করণ।

∇ শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন যার ফলে সবার পক্ষেই অন্ততঃ সংখ্যা গনন ও পঠনের মত বাহ্য ও মাপন যোগ্য শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়।[১০]

---

১০. লুৎফর রহমান খান এবং এ, এইচ, এম, মহিউদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪-১০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

৪. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৪.১. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক প্রশাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উপর ন্যস্ত। শিক্ষা মন্ত্রী মন্ত্রনালয়ের প্রধান। অপরদিকে অর্থ সংক্রান্ত বিষয় সমূহের নির্বাহী প্রধান মন্ত্রনালয়ের সচিব। শিক্ষা সম্পর্কিত সকল নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত মন্ত্রনালয়ে গৃহীত হয়। এছাড়া শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আন্তঃ মন্ত্রনালয় বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা মন্ত্রনালয় দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার দায়িত্ব নিম্নোক্ত মন্ত্রনালয় ও বিভাগের ওপর ন্যস্ত-

ক) শিক্ষা মন্ত্রনালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা)

খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (PMED)

(প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা)

বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে রয়েছে। তাঁকে সহায়তা দানের জন্য রয়েছেন একজন উপদেষ্টা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের জন্য একজন সচিব (স্থায়ী সুশীল সেবক) রয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) রয়েছে। এ অধিদপ্তরের প্রধান হচ্ছেন একজন মহাপরিচালক। এছাড়া, গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DNFE) রয়েছে যার প্রধান হলেন একজন মহাপরিচালক।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ৬ টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলা ও ৪৬৭ টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যাদি পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় উপ-পরিচালক (DD) জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (DPEO),ও উপজেলা সদরে উপজেলা শিক্ষা অফিসার (UEO) নিয়োজিত রয়েছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে সহায়তা করার জন্য প্রতি উপজেলায় একাধিক সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (AUEO) রয়েছে। এছাড়া মেট্রোপলিটান সিটি গুলোতে প্রতি থানার জন্য থানা শিক্ষা অফিসার (TEO) ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO) রয়েছে।[১]

১. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত চিত্রে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রদর্শন করা হলোঃ[২]

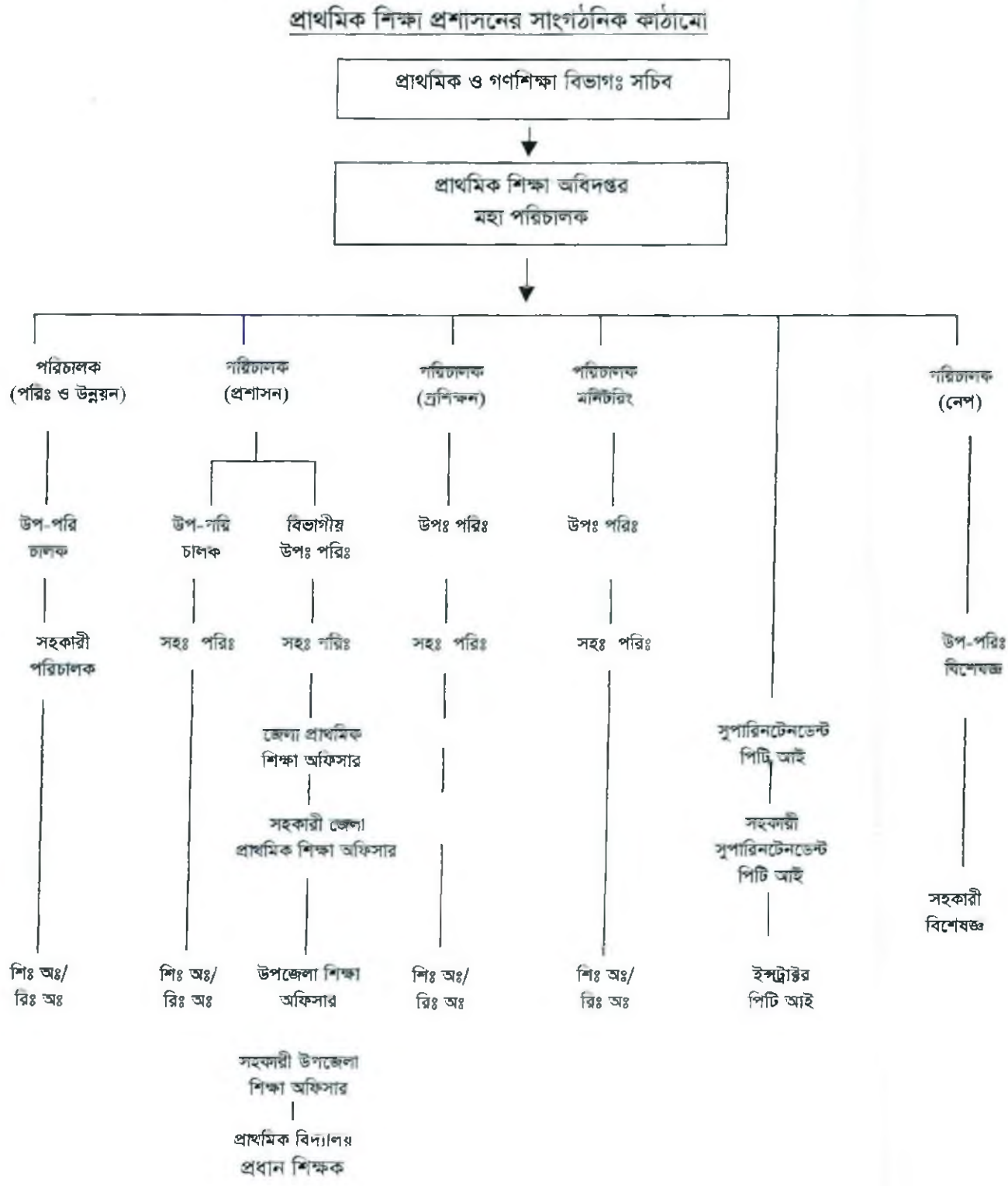

২. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২. বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষাক্রমঃ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে কর্মমূখী করা এবং পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা হতে কলমে শিক্ষাদানকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। ১৯৯১ সালে দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে ও বাধ্যতামূলক হওয়ার কারনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ঘঈঞই)কে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী করে পরিমার্জনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে এন সি টি বি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন পরিকল্পনা গ্রহন করে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ১৯টি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে এবং ১৯৯২ সাল থেকে ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা সম্বলিত প্রাথমিক স্তরের জন্য আবশ্যকীয় শিখন ক্রম গৃহীত হয়।

এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষাক্রমে বাংলা (মাতৃভাষা), গণিত, পরিবেশের সাথে পরিচিতি ও দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের উপলব্ধির জন্য পরিবেশ পরিচিতি, ধর্মীয় ও নৈতিক গুন বিকাশেরজন্য ধর্ম শিক্ষা এবং সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টির জন্য চারু ও কারুকলা ও সঙ্গীত বিষয়কে নির্ধারণ করা হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা ও শিক্ষাক্রমের অপরিহার্য বিষয়রূপে নির্ধারিত হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজীকে শিক্ষাক্রমের অন্তভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত ও পরিমানগত মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকে পরিমার্জন ও নবায়ন করে আবশ্যকীয় শিখনক্রমের ভিত্তিতে যোগ্যতা ভিত্তিক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রনয়নে নবতর ধারনার সংযোগ ঘটিয়ে চালু করা হয়েছে "যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম"। কোন পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ অর্জন করে তার সমষ্টিকে 'যোগ্যতা' বোঝায়। অবশ্য পূনাঙ্গ যোগ্যতা অর্জন হবে তখনই যখন শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা অর্জন করে তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্তর ধরা হলে এ স্তরের শিক্ষন শেষে সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সে সব যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব তা 'প্রান্তিক যোগ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত। প্রাথমিক স্তরের জন্য মোট ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। অপর দিকে প্রান্তিক যোগ্যতাকে শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন করে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো শ্রেণী ভিত্তিক যোগ্যতা **(Class- wise competency)** বলে বিবেচিত। শিক্ষাক্রমের অভিপ্রায় হল ৫ম শ্রেণী শেষে ৫৩টি যোগ্যতার পূর্ন আয়ত্তকরণ। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের নির্ধারিত ১১টি বিষয়ের বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতার সংখ্যা সকল বিষয়ে এক নয়। সকল বিষয়ে সর্বমোট যোগ্যতার সংখ্যা ১৭৯ টি।[৩]

৩. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত ছকে বিষয়ের নামসহ বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতা উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতার সংখ্যা	শোনা	বলা	পড়া	লেখা
১.	বাংলা (মাতৃভাষা)	২৪	২	৬	১০	৬
২.	ইংরেজী	২৯	৪	৮	৮	৯
৩.	গণিত	৩৩				
৪.	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ, বিজ্ঞান)	১৪				
৫.	চারু ও কারুকলা	১৪				
৬.	শারীরিক শিক্ষা	৮				
৭.	সঙ্গীত	৯				
৮.	ধর্মঃ ইসলাম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান	৫ ১৬ ১৫ ১২				

উপরোক্ত ছকে ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারন করা হয়েছে।[৪]

৪. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আন্তঃ পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। সাধারণতঃ বছরে তিনটি পরীক্ষা নেয়া হয়। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর জন্য ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বা শিখণ ফলের মূল্যায়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নম্বর প্রাপ্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষা মে ও আগষ্ট মাসে নেয়া হয় এবং বার্ষিক পরীক্ষা সাধারনতঃ নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে নেয়া হয়। বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রেণী ভিত্তিক অর্জন উপযোগী নির্ধারিত যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়। নিদিষ্ট নম্বর প্রাপ্তি শর্তে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয় ও পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ন করা হয়। নিদিষ্ট নম্বর বা মান অর্জনে ব্যর্থ শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ন হতে পারে না।

প্রাথমিক স্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতির অগ্রগতি মূল্যায়নে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (CPE) অনুসরন করা হয় । অবিভক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর 'নমনীয় প্রমোশন' পদ্ধতিতে ১ম শ্রেণীতে এক বছর শেষ হলেই সকল শিক্ষার্থীকে ২য় শ্রেণীতে তুলে দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রমোশন দেয়া হয়। শ্রেণী উত্তরণ বা প্রমোশনের কড়াকড়ি নেই। এ ক্ষেত্রে মূল্যায়ন রেজিষ্টারে তিন মাত্রা স্কেলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড করা হয়। শ্রেণী পাঠনার পাশাপাশি এ কাজটি চলে। অর্থাৎ ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষন শিখন কাজ সম্পাদন হয় এবং সকল শিক্ষার্থীকে শ্রেণীর সমমানে উন্নীত করা হয়। তবে পাঠে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীকে 'নিরাময়' পদ্ধতিতে সহায়তা দান করে শ্রেনীর সমমানে উন্নীত করা হয়। ১ম শ্রেণীর পরীক্ষা মৌখিক ও ২য় শ্রেণীতে কিছু কিছু লিখিত ও অধিকাংশ মৌখিক পরীক্ষা হয়। এক বছরে দশটি মাসিক মূল্যায়ন হয়।

৫ম শ্রেণী শেষে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা মূলক বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েকে বছরের শুরুতে বই কেনার জন্য এককালীন ও মাসিক হারে টাকা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর মেধার স্বীকৃতি ও উৎসাহদানের উদ্দেশ্য এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।[৫]

---

৫. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বহুদিন থেকে চলে আসছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি. ইন. এড.) কোর্স পরিচালিত হচ্ছেঃ

ক) **প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পি. টি. আই.)ঃ** সি. ইন. এড. প্রশিক্ষন কোর্সে ভর্তির জন্য মহিলাদের এস এস. সি. (২য় বিভাগ) এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এইচ. এস. সি (২য় বিভাগ) পাশ হতে হয়। এক বছর ব্যাপী প্রশিক্ষন দানের পর সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন সনদ প্রদান করা হয়। এই কোর্সের পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে ময়মনসিংহস্থ ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন (NAPE) । সি. ইন. এড. কোর্স মূলতঃ চাকুরী পূর্ব বা Pre-service হলে ও বর্তমানে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্যই এ কোর্স নির্ধারিত।

খ) **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)ঃ** সম্প্রতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন ৬ মাস মেয়াদী সিমেষ্টরের ৩ সিমেষ্টরের মাধ্যমে সি. এড. কোর্স প্রবর্তন করেছে। বাউবির সি. এড. কোর্সের ১ম সিমেষ্টর ২০০০ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে। এ কোর্সে প্রশিক্ষনের দায়িত্ব পালন করেন পি.টি. আই. এর প্রশিক্ষকগন। এর উদ্দেশ্য হলো পি. টি. আই. ও বাউবির সি. এড. প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষনের মান সমতুল্য করা। এ জন্য পি.টি. আই. গুলোতে সি. এড. কোর্সের টিউটোরিয়াল সেন্টার করা হয়েছে। সি. এড. কোর্স একটি প্রি সার্ভিস কোর্স।

এ কোর্সের শিক্ষাক্রম পি.টি.আই. গুলোতে পরিচালিত নিয়মিত সি. ইন. এড. কোর্সের অনুরূপ। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, চলমান প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ের উপর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (NAPE) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষন শাখা সারা বছর ধরে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য এ জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তে অংশ গ্রহন বাধ্যতামূলক।

সম্প্রতি প্রাথমিক স্তরে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্ম-কর্তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরাসরি প্রশিক্ষন, ওরিয়েন্টেশন ও সেমিনার আয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত উপজেলা পর্যায়ে নবগঠিত প্রতিষ্ঠান 'উপজেলা রিসোর্স সেন্টার' (URC) স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এ সমস্ত সেন্টারে প্রশিক্ষন গ্রহন করে থাকেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশিক্ষন কোর্স সমূহের আয়োজন URC সমূহের কাজ।[৬]

---

৬. লুৎফর রহমান খান, এ. এইচ. এম. মাহি উদ্দিন, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, (সম্পাদনায়), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ সবার জন্য শিক্ষাঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা-

১৯৮০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে গৃহীত ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব ঘোষনায় স্বাক্ষরদান, ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু সম্মেলন, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে সার্ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত শিশু সম্পর্কিত কলম্বো প্রস্তাব, ১৯৯৩ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৯টি উচ্চ জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশের শীর্ষ সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহন এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দেশ ব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু এবং দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ।

সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য খুবই ইতিবাচক। এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য হচ্ছে-

- দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- প্রাথমিক স্কুলে শিশু ভর্তি বাড়ছে,
- মেয়ে শিশুর সংখ্যা ও উপস্থিতির হার বাড়ছে।
- প্রাথমিক স্কুলে নতুন শিক্ষকদের ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নীতি অনুসরন করা হচ্ছে, মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা

বছর	কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকা			
	মোট	শিক্ষক	শিক্ষিকা	শিক্ষিকা (%)
১৯৯১	১৬০০৯৮	১২৬৩৪১	৩৩৭৫৭	২১.১
১৯৯২	১৫৬৪৮০	১২২৭০০	৩৩৭৮০	২১.৬
১৯৯৩	১৫৭৬৩৩	১২০১০৪	৩৭৫২৯	২৩.৮
১৯৯৪	১৫৯১৪৯	১১৯৩২৫	৩৯৮২৪	২৫.০
১৯৯৫	১৫৮৬৫৮	১১৫৯৫০	৪২৭০৮	২৬.৯
১৯৯৬	১৬১৪৫৮	১১৬২৫০	৪৫২০৮	২৮.০
১৯৯৭	১৫৮০৫৭	১১৩৬৫৫	৪৪৪০২	২৮.১
১৯৯৮	১৫৩২৪৭	১০৫৩৯২	৪৭৮৫৫	৩১.২
১৯৯৯	১৫৮৩১৭	১০৫০৭২	৫৩২৪৫	৩৩.৬
২০০০	১৫৮২১৬	১০৪৫৮৮	৫৩৬২৮	৩৩.৯
২০০১	১৬২০৯০	১০১০৮২	৬১০০৮	৩৭.৬

(উৎসঃ Primary Education statistics In Bangladesh- Directorate of Primary Education Primary and Mass Education Division, Page-9)

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষকের সব শূণ্যপদ পূরন করে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫০ঃ১ রাখার চেষ্টা চলছে।
- বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলসমূহকে রেজিষ্ট্রেশন দেয়া হচ্ছে।
- স্বল্পব্যয়ী ও স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (ক) অবিভক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণী (খ) প্রান্তিক যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম (গ) ধারাবাহিক মূল্যায়ন (ঘ) ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষন (ঙ) নিরাময়মূলক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- পৌর এলাকার বাইরে দেশের সকল মাধ্যমিক স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক।
- মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে।
- পরিবারের একমাত্র সন্তান কন্যা হলে স্নাতক স্তর পর্যন্ত তার শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষা কমপ্লেক্স স্থাপিত হয়েছে, বিশেষ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও উপকরন উন্নয়ন চলছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে কর্মরত এনজিওদের প্রতি রাষ্ট্রীয় উদার নীতির ফলে এসব এনজিও ১৯৮০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শিক্ষা উপকরন প্রনয়ন, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং তাদের সামগ্রিক শিক্ষা কর্মসূচির উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক গবেষনা ও উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছে। এ সব এনজিওর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক (এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৪২,০০০ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে, যেখানে আনুমানিক ১৫ লক্ষ ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে), প্রশিকা, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স এবং আরও বেশ কিছু ক্ষুদ্রাকার এনজিও। এদের বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কৌশল অবলম্বনের ফলে মৌলিক শিক্ষালাভে মেয়েদের, বিশেষ করে গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের কিশোরীদের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুগ ও সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরে সম্প্রসারিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জমতিয়েন উত্তর প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় ২০০০ সাল নাগাদ জাতীয় লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর ভর্তির হার ৯৫% এ উন্নীতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৭০% এ উন্নীতকরণ। সরকাররের নিজস্ব তহবিল ও বৈদেশিক অর্থ সহায়তায় বাংলাদেশ শুধুমাত্র এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই করেনি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এ লক্ষ্য মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে স্কুল ভর্তির হার ৯৭% ছাড়িয়ে গেছে। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং যুগান্তকারী কিছু কর্মসূচী গ্রহনের ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে দরিদ্র পরিবারকে তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরনের "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী"। প্রথম বছরে প্রতিটি উপজেলার একটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে ১২৫৫টি ইউনিয়নে তা সম্প্রসারন করা হয়। বিগত সরকারের শাসনামলে খাদ্য সহায়তা বিতরণে ডিলারশীপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনিয়ম ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ কর্মসূচীকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০২ সালের জুলাই থেকে খাদ্য শস্য

Dhaka University Institutional Repository

(গম/চাল) প্রদানের পরিবর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং এ লক্ষ্যে নতুন " উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের" বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের এক সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরনের জন্য মাসিক এক শত টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য একশত পঁচিশ টাকা দেয়া হচ্ছে। নির্বাচিত প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চল্লিশ শতাংশ শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। প্রতি বছর ৬৬৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক সহায়তা পাবে। এ কর্মসূচী প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে।[৭]

বিগত বছর গুলোতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার ৬৫.৫ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপভাবে বাড়েনি শিক্ষার গুণগত মান। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রথম দিকে উচ্চহারে নীট ভর্তি হারে অগ্রগতি অর্জন সত্ত্বেও (নীট ভর্তি হার ১৯৯০ সনের ৬০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সনে ৭৬% হয় এবং আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সনে ৮১% হয়), এখনও দেশে বহু ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী মোট ১ কোটি ৯০ লক্ষ শিশুর মধ্যে ৩৫ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। শিশুদের এই বিপুল অংশকে বিদ্যালয় নিয়ে আসা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত ও পরিমানগত মানোন্নয়নে বিভিন্নমূখী পদক্ষেপ নেয়া হলেও শুধু মাত্র পরিমানগত ক্ষেত্রে উন্নয়ন হলেও গুনগত ক্ষেত্রে উন্নয়ন হতাশা ব্যাঞ্জক বলা যায়। গুনগত মান অর্জনের জন্য অতিক্রম করতে হবে এখন ও অনেকটা পথ। প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নমান একটা উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার নিম্নমানের কারনগুলো হচ্ছেঃ

ক) স্বল্পকালীন শিক্ষক-শিক্ষার্থী যোগাযোগ।

খ) কার্যকর পাঠদান-তদারকির অভাব।

গ) শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উচ্চ অনুপাত (যা ১৯৯৯ সনে ছিল ৫৯ঃ১) এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এই অনুপাতের উল্লেখযোগ্য অসমতা (যেমন এই অনুপাত বরিশাল বিভাগে ৪৪ঃ১ কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগে ৭৪ঃ১)।

ঘ) সম্পদ সংগ্রহ এবং বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপনায় সামাজিক অংশগ্রহনের অভাব।

ঙ) বহু সংখ্যক বিদ্যালয়ে ভৌত সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব।

চ) জীবন কেন্দ্রিক বাস্তবমূখী শিক্ষাসূচীর অভাব।

ছ) উপযুক্ত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত এবং উদ্যোগী শিক্ষকের অপ্রতুলতা।

জ) প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাব।

ঝ) সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষক পাঠ্য পুস্তকের অভাব।

ঞ) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ, খেলার সরঞ্জাম ও লাইব্রেরীতে পুস্তকের অভাব।

---

৭. The Daily Star- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ- ২০০২, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৪-১৮ কার্তিক, ২৯শে অক্টোবর-২০০২, পৃষ্ঠা-৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ অবস্থার উন্নতিকল্পে গৃহিত পদক্ষেপগুলো হচ্ছেঃ

ক) যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন এবং বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাপোকরণ বিতরণ।

খ) শিক্ষক প্রশিক্ষন কার্যক্রম জোরদার করন ও শিখন-শিখানো পদ্ধতি পরিমার্জন ও উন্নয়ন।

গ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিখন-শেখানো ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষন বিকেন্দ্রিকরন ও একাডেমিক সুপারভিশন প্রবর্তন।

ঘ) প্রশাসনিক পরিদর্শন জোরদার করে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা আনয়ন হোম ভিজিট প্রবর্তন।

ঙ) বিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পারফরমেন্স রিপোর্টিং প্রবর্তন ও পারফরমেন্সের ভিত্তিতে বিদ্যালয় শ্রেণী বিন্যাসকরন।

চ) দুই শিফটের বিদ্যালয় গুলোকে এক শিফটে রূপান্তর করে পাঠদান সময় বৃদ্ধি করা।

ছ) শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনা।

জ) অংশগ্রহনমূলক, শিশু কেন্দ্রিক বা এবং আনন্দদায়ক পাঠদান পদ্ধতির প্রচলন।

ঝ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দেশী ও বৈদেশিক প্রশিক্ষন সুযোগ সৃষ্টি ও

ঞ) ব্যাপক সমাজ সম্পৃক্তকরন ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন।[৮]

এছাড়াও ভৌত সুযোগ সুবিধা সম্প্রাসারনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯০% বিদ্যালয়কে পুনঃ নির্মান বা সংস্কার করা হয়েছে। দেশের সব রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ২০০৩ সালের মধ্যে পুনর্নির্মান করা হবে। গ্রামীন যে সকল বিদ্যালয়ে ৪০০ এর অধিক ছাএ-ছাত্রী রয়েছে যে সকল বিদ্যালয়ে দ্বিতল ভবন নির্মান বা কক্ষ সম্প্রসারনের কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা লেট্রিন নির্মান করা হচ্ছে। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে সব বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এনজিওদেরকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এজন্য এনজিওদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। দেশের ছয়টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের জন্য নির্মান করা হয়েছে আলাদা বিভাগীয় কার্যালয়। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষন সুবিধা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। উপজেলা রির্সোস সেন্টার ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে ১৭৪টি উপজেলা রির্সোস সেন্টার। শিক্ষকদের প্রশিক্ষন দিয়ে মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার ওপরও জোর-

৮. The Daily Star- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ- ২০০২, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৪-১৮ কার্তিক, ২৯শে অক্টোবর-২০০২, পৃষ্ঠা-৯।

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে এবং সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে দেশের প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার লাভের অধিকারকে নিশ্চিত করি।[৯]

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রচেষ্টা ঃ-

শিক্ষা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কোন একটি দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে শিক্ষা। আর সব শিক্ষার বুনিয়াদই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। তাই জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগনের শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দেশে প্রবর্তন করা হয়েছে "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম"। ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বরে জাতি সংঘের মানব অধিকার ঘোষনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে "Everyone has the right to get education and it should be free up to the primary and basic level[১১] অথাৎ প্রতিটি ব্যক্তির শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। অন্ততঃ পক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত।" এই ঘোষনার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী গ্রহনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটি শাসনতান্ত্রিক ওয়াদা। বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রের ১৭ নম্বর ধারা ও সুস্পষ্ট ভাবে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিত এমনকি প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক করার স্বপক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে এবং জনগনকে শিক্ষা সচেতন করে ছাত্র/ছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ এবং একই শ্রেনীতে বারবার অধ্যয়ন জনিত অপচয় রোধ করাই হচ্ছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা লাভ করার যোগ্যতা সম্পন্ন সকল শিক্ষার্থীর জন্য পরিকল্পিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাকেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলতে পারি। আমাদের দেশের পটভূমিতে ৬+ থেকে ১০+ বয়স্ক সকল স্বাভাবিক শিক্ষার্থীর জন্য পরিকল্পিত আনুষ্ঠানিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাকেই আমাদের দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলা যায়।[১০]

---

৯. The Daily Star- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ- ২০০২, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৪-১৮ কার্তিক, ২৯শে অক্টোবর-২০০২, পৃষ্ঠা-৯।

১০. খেলাঘর- শিশু অধিকার বাংলাদেশে, আব্দুল আজিজ (সম্পাদনা), কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর (প্রকাশনা), প্রকাশকাল- মার্চ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। প্রাইমারী শিক্ষকদের সরকারী চাকুরীতে অর্ন্তভুক্ত করে উপযুক্ত বেতনক্রম ও আনুসাংগিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এতে শিক্ষকদের মনে নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৫ সালে গঠিত জাতীয় সিলেবাস ও কারিকুলাম কমিটির সুপারিশের আলোকে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যবই প্রনয়ন করা হয়েছে এবং ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে প্রবর্তণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়গামী বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে মাত্র ৫০ জন দ্বিতীয় শ্রেনীতে ওঠার আগে বিদ্যালয় ছেড়ে দেয় এবং শতকরা ২০% জন পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেনীতে পৌছায়। যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একটি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।[১১]

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় বয়সী সকল ছেলে মেয়েদের যদি বাধ্যতামূলক ভাবে কমপক্ষে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়, তা হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জন সম্পদের বিরাট অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০ জনে এসে দাড়াবে। প্রাথমিক শিক্ষা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রস্তাবিত পাঠশালা পরিকল্পনার অন্তভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার আরেকটি অংশ হলো গণশিক্ষা। বাংলাদেশে গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৮০ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বছর, কেননা এ সাল থেকেই সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সারা দেশে "স্বাক্ষরতা" অভিযান শুরু হবে এবং এ জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয় যাতে এক বছরেই ১১-৪৫ বয়সের ১কোটি নিরক্ষর লোককে স্বাক্ষর করে তোলা যায়। ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে শিক্ষা মন্ত্রনালয় গণশিক্ষা কর্মসূচী মূল্যায়নের জন্য 'গণ শিক্ষা মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করেন। কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় 'গণশিক্ষা' মূল্যায়ন কমিটি কাজ শেষ হবার আগেই সরকার গণশিক্ষা কর্মসূচী মূলতবী রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচীর সকল তৎপরতা বন্ধ করে দেয়।[১২]

---

১১. জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, মোহাম্মদ ইবনে ইনাম, ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬. প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে গৃহীত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের পাঁচটি পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক সার্বজনীন ও আবশ্যিক করার বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু তা অবাস্তবায়িত থেকে গেছে।

১ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)ঃ বাংলাদেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) শিক্ষা সংক্রান্ত একটি উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, সকল শিশুর জন্য অন্ততঃ পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এই পরিকল্পনা কালেই প্রাথমিক শিক্ষার গবেষনা ও শিক্ষক প্রশিক্ষনে আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনের জন্য দেশে মৌলিক একাডেমী নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষাকে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান (পিটি আই) গুলোকে উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহনের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া বিদ্যালয় সংস্কার, ৫০০০ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৫৮% থেকে বৃদ্ধি করে ৭৩% করার জন্য এবং পাঠ্যক্রম প্রনয়ন এবং ঝড়ে পড়ার হার ৬৩% থেকে ৫২% হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়।[১৩]

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)ঃ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন শিক্ষা নীতি চালু করা হয়। অন্তবর্তীকালীন শিক্ষা নীতির রিপোর্টে ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক অর্থাৎ দু'বছরের অন্তবর্তী কালীন উন্নয়ণ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ছিল ৮০ কোটি টাকা।

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক এবং পি,টি,আই এর প্রশিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষনদানের জন্য 'নেপ' ((National Academy for Primary Education) ময়মনসিংহে স্থাপন করা হয় এবং ৫১টি পি,টি,আই এর উন্নয়ণ ও পূনঃ সংস্কার করা হয়।

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী সমাজের মর্যাদা এবং শিক্ষার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। বলা হয় যে, শিক্ষার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত যাতে নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর হয়।

- তালিকাভুক্তি
- ড্রপ আউট
- গ্রামও শহরের মধ্যে পার্থক্য।

---

১৩. Directorate of Primary Education, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার সফলতার সাথে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে যাতে করে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং পড়ালেখা সমাপ্ত করার পূর্বে ঝড়ে পড়া রোধ করা যায়।[১৪]

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

বাংলাদেশের দ্বিতীয় পাঁচশালা প্রকল্প (১৯৮০-৮৫) প্রণয়ন কালে বাংলাদেশ সরকারের দেশের গোটা শিক্ষা খাতের প্রায় ৪২% টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে। এই অর্থে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাংলাদেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পকে নিম্নোক্ত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১। বিশ্ব ব্যাংক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প ও

২। জাতীয় সরকারের অর্থে পরিচালিত প্রকল্প।

বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প পরীক্ষামূলক দেশের আটটি জেলায় চল্লিশটি থানায় ব্যাপ্ত। পাঁচ বছরে এই প্রকল্পের ব্যয় ৬৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে।[১৫]

এই দুটি প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ন অর্জন সমূহ ছিল-

- ☐ ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা।
- ☐ মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বধান ও পরিদর্শনের জন্য ১,৮৩৪ টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি।
- ☐ ১৯৮৫ সাল থেকে বিনামূল্যে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরন।
- ☐ শিক্ষা উপকরন ও আসবাবপত্র সরবরাহ
- ☐ শিক্ষক এবং ষ্টাফদের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষনের আয়োজন।
- ☐ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে ইউনিফর্ম বিতরন।
- ☐ ৫০০টি পদে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ
- ☐ বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ১১,২৭৪টি ক্লাশরুম নির্মাণ, ৯,৪২১টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার সাধন, ৬২৪২টি টিউবওয়েল স্থাপন এবং ৫,৭৪৫টি টয়লেট নির্মাণ।

---

১৪. জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, মোহাম্মদ ইবনে ইনাম, ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯১।

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা- ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

- একটি নতুন প্রথা বা কর্মসূচী প্রবর্তিত হয়েছিল যা ইমপ্যাক্ট (The Instructional Management-by Parents,Community and Teachers-IMPACT) নামে পরিচিত ছিল। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য সমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ইমপ্যাক্ট শিক্ষা পদ্ধতি অন্যতম বিকল্প উপায় হিসেবে চিন্তা করা হয়েছে। এবং টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানার এলেংগা ও মহদেবপুর ইউনিয়নের ১৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তা আরও ১০টি জেলায় সম্প্রাসারিত করা হয়েছিল। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ফলদায়ক কৌশল নির্ধারনের জন্য "সমাজ শিক্ষা প্রকল্প" (সি,এল,সি) নামে আরেক টি পরীক্ষামূলক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহন করা হয়। ইউনিসেফের সহায়তায় এটি চালু হয়। এই দুইটি প্রকল্প বিদ্যালয় ও ক্লাশরুম ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় পর্যায়ের জনগনকে সম্পৃক্ত করে এবং ভবিষৎ উন্নয়ণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা স্বরূপ কাজ করে।[১৬]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়ে শিশু এবং নারীদের উন্নয়নের জন্য সর্বক্ষেত্রে বাস্তব মুখী পদক্ষেপ নেয় হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করন।
- নারীদের স্বাক্ষরতার হার ৫০% বৃদ্ধি করা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে নিরক্ষরতার পার্থক্য দূর করা।
- নারীদের জন্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা।

এছাড়া সংশোধিত ভাবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (জাতীয় পর্যায়ে) গ্রহন করা হয়। এই পরিকল্পনার সময়কালে দুটি বন্যা পূর্নবাসন, প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছিল।

১) দ্বিতীয় বন্যা পূর্ণবাসন প্রকল্প যা বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় করা হয়েছিল এবং
২) বন্যা পরবর্তী পূর্ণবাসন প্রকল্প যা ই,ই,সির সহায়তায় করা হয়।

১৬. জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, মোহাম্মদ ইবনে ইনাম, ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল-

- বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের তালিকাভুক্তির হার ৬০% থেকে ৭০% বৃদ্ধি করা।
- বিদ্যালয়ে তাদের হাজিরা নিশ্চিত করা।
- পাঠ্যবই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে বিতরন করা।
- অগ্রিম প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধি করা।
- উন্নততর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন।
- বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন। ৯,২৮৫টি বিদ্যালয়ের পূর্ন নির্মান এবং ১৬,২৫৭টি বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামত করা।
- নিদিষ্ট কিছু আসবাবপত্র সরবরাহ করা এবং শিক্ষা উপকরন প্রদান করা।
- ১০০০ বিদ্যালয়কে সরকারীকরন এবং অতিরিক্ত ৪০০০ শিক্ষক নিয়োগ।
- ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS)প্রতিষ্ঠাকরন।[১৭]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক এবং গনশিক্ষা কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপ্রদান করে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয়। "প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা বিভাগ (মন্ত্রনালয়) নামে নতুন একটি বিভাগ ১৯৯১সালে গঠন করা হয়। এটি ছিল একটি বাস্তবমুখী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো কে শক্তিশালী করন এবং আধুনিক ও সময়োপযোগী ও অশিক্ষা দূরীকরনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৩ সালে সারাদেশে বাধ্যতামূল প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ করা হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সমূহ ছিল-

- প্রাথমিক বিদ্যালযে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করন।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নতিকরন।
- শিক্ষাক্রম ও শিক্ষোপকরনের পরিমার্জণ ও উন্নয়ন সাধন।
- একাডেমিক তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসনিক পরিদর্শন ও তদারকের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা।

---

১৭. Directorate of Primary Education, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন পাস হয়। ১৯৯২ সালে ৬৮টি থানা এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে সমগ্র দেশে এই কর্মসূচী সাফল্যজনক ভাবে চালু করা হয়। এই কর্মসূচী সাফল্যজনক ভাবে পরিচালনা করার জন্য "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন ইউনিট" (CPEIMU) গঠন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের মধ্যে সমতা আনয়ন ও বৈষম্য দূরীকরন, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ানো এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধি এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের জন্য "সাধারন শিক্ষা প্রকল্প" (GEP) এর আওতায় তিনটি গুরুত্বপূর্ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়-

১) ঢাকা রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ণ।
২) চট্টগ্রাম বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ণ এবং
৩) প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই ও শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন প্রকল্প।

সাধারন শিক্ষা প্রকল্প (জি,ই,সি) ও অন্যান্য প্রকল্পের কারনে এই সময়ে যে সাফল্য ও লক্ষ্য সমূহ অর্জিত হয়েছিল সে গুলো ছিল-

- ১,১৩৪টি স্বল্প ব্যয়ে স্কুল নির্মাণ।
- ৭,৬৭৫ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ন নির্মান এবং ৯,৩৩৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন ৭,৪১২টি রেজিষ্ট্যার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ণ।
- বর্তমানে নির্মাণকৃত, পূনঃ নির্মানকৃত এবং মেরামতকারী বিদ্যালয় গুলোতে আসবাবপত্র সরবরাহ।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীতে ভর্তিযোগ্য শিশুদের জন্য ২০০ স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সম্প্রসারন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান গুলোর উন্নয়ণ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস নির্মানি ও সংস্কার সাধন এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিক্ষা অফিস নির্মাণ।
- ৪,৯৭,৩৫৮ জন ছাত্র/ছাত্রীকে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের আওতায় আনা হয় যা এন জিও দের দ্বারা পরিচালিত হতো।
- ১০টি থানার ৬,৮৯টি স্কুলের মধ্যে "বিদ্যালয় আকর্ষনীয়করন কার্যক্রম" চালু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৪,০০,০০০ শিক্ষার্থী উপকৃত হয়।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭,৭২,৯০,০০০ পাঠ্যবই বিতরন।
- ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ৪৬০টি ইউনিয়নের ৪,৯১৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে তা আরও বৃদ্ধি করে ১০০০ ইউনিয়নের ১২,১৮২টি বিদ্যালয়ে চালু করা হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ গুলো সাফল্যজনক ভাবে কার্যকরী হয়। ১৯৯৫ সালে বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তি ও ভর্তি বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.২ মিলিয়নে দাড়ায়। যা ১৯৯০ সালে ছিল ১২মিলিয়ন। ১৯৯৫ সালে বিদ্যালয়ে ঝড়ে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ৩৮% যা ১৯৯১সালে ছিল

Dhaka University Institutional Repository

৫৯.৩০%। প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশ গ্রহন ও বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ে অনুপাত ছিল ৫৫.২৮ঃ৪৪.৭২, ১৯৯৫ সালে এই অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৫২.৬২ঃ৪৭.৩৮। ১৯৯০ সালে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকার হার ছিল ২০.৫৭% সেখানে ১৯৯৫ সালে তা বৃদ্ধি পায় ২৬.৯২%। এটা শূণ্যপদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার যে নীতি সরকার গ্রহন করেছিল তার ফলস্বরুপ।[১৮]

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৫-৯৭)

এই দুই অর্থ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্জিত সাফল্য সমূহ ছিল।

- স্বল্প ব্যয়ে ২,২৮১টি বিদ্যালয় নির্মান।
- ৫,৬৪,৬ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মান এবং ৮৯০টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।
- ৫৪২টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মান এবং ২৯২টি বিদ্যালয় সংস্কার করা হয়।
- ১৩টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং ৫টি থানা শিক্ষা অফিস নির্মাণ করা হয়।
- শিক্ষা উপকরন যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়।
- ১৯৯৬ সালে ৫,৩৩,০০০,০০টি পাঠ্য বই এবং ১৯৯৭ সালে ৮,২৩,০০,০০০ টি পাঠ্য বই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরন করা হয়।
- ১৯৯৭ সালে ১,০৪৬টি স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় মোট ২,৩৭,২৭৩ মেট্রিক টন গম এবং ৩,৮৯৭ মেট্রিক টন চাল বিতরন করা হয়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ৬৭,৭৬০ মেট্রিক টন গম এবং ২,০৯,৬২৫ মেট্রিক টন চাল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরন করা হয়।[১৯]

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতিমালা গ্রহন করেন। 'সবার জন্য শিক্ষা' এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য এই পাঁচ শালা পরিকল্পনায় যে নীতিমালা নেয়া হয় তা হচ্ছে-

---

১৮. Directorate of Primary Education, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮-৯।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১১।

Dhaka University Institutional Repository

- বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৯৫ ভাগ ভর্তির হার নিশ্চিত করন, বিশেষভাবে মেয়ে শিশুদের ভর্তির উপর জোর দেয়া হয়েছে।
- শতকরা ৭৫ ভাগ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি করন।
- শিক্ষকদের মান সম্মত প্রশিক্ষন প্রদান এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- শিক্ষাক্রম ও শিক্ষোপকরনের পরিমার্জন ও উন্নয়ন সাধন।
- থানা পর্যায়ে কার্যকর তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- গবেষনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা সমূহের পরিবর্তন ও নতুন প্রথা চালু করা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে অধিক জোর দেয়া।
- লিঙ্গ বৈষম্য এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা দূরীকরন।
- একজন সুনাগরিক হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মাঝে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে কাজ করা।

এছাড়া এই সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা হলো-

- নতুন বিদ্যালয় নির্মান।
- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে অতিরিক্ত ক্লাশরুম নির্মাণ।
- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনুযায়ী সংস্কার ও মেরামত করা।
- স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা।
- থানা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন।
- শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প চালু রাখা।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষন।
- ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।[২০]

২০. Directorate of Primary Education, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের শতকরা হার (%)

বিভিন্ন পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			
পরিকল্পনা সমূহ (সন)	মোট বরাদ্দ	শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ	শতকরা হার
১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮ জুলাই)	৪৪৫৫	৩১৬	৭.১
দ্বি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮জুলাই ১৯৮০জুন)	৩৮৬১	১৮০	৫.০
২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)	২৫৫৯৫	৯০৫	৩.৫৪
৩য় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-১৯৯০)	৩৮৬০০	১৩৭০	৩.৫৫
৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫)	৬৭২৩০	২৪০১	৩.৫৭

এই সমস্ত পদক্ষেপ গুলো সাফল্য জনকভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। পঞ্চম পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।[২১]

২১. মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ মনজুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান ও হার।

পরিকল্পনা কাল	শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রাথমিক শিক্ষা উপ খাতে		মাধ্যমিক শিক্ষা উপখাতে	
		মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	শতকরা হার (%)	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	শতকরা হার (%)
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩- ১৯৭৮)	২৮৩৩০	৫৭,৭২	২০.৩৭	৫৯,৮৮	২১.১৪
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)	১৩৭৮৩	২২,৩২	১৬.২০	২৮,৭৭	২০.৮৮
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	৯৩২৫০	৪১৫,০০	৪৪.৫০	১৮৮,৫০	২০.২২
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	৯৮৮১৮	৫৩৮,০০	৫৪.৪৫	১২৫,০০	১২,৬৫
৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)	২৩৩৯৪০	১১৬২,২৭	৪৯.৬৮	৭৬৭,৮৫	৩২.৮৩

বাংলাদেশে এ যাবৎকাল পর্যন্ত গৃহীত পরিকল্পনা সমূহ পর্যালোচনা করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মোট ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। কোন জাতির উন্নয়নের জন্য এটি কাঙ্খিত নয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর মতে কোন দেশের মোট জিডিপির (GDP) শতকরা ৭ থেকে ৮ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। অথচ আমাদের দেশে তা মাত্র শতকরা ১.৬১ শতাংশ।[২২]

২২. মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ মনজুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭. প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত বাজেটঃ

মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশে গৃহীত হয়েছে নানা পদক্ষেপ। ফলে সাম্প্রতিক কালে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের শিশুদের অংশগ্রহনের হার অনেক বেড়েছে। বর্তমানের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকল বালিকার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "সবার জন্য শিক্ষা" অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিগত তিন দশক যাবৎ মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৯০ এর দশককে প্রাথমিক শিক্ষা ও মেয়ে শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নের মাইল ফলক হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। ১৯৯২ সালে তৎকালীন সরকার "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ" নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, "প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ হতে সরকার সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করেছে।

অন্যান্য বছরের ন্যায় ১৯৯৪-৯৫ সালে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (১৬.২৫%)। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শতকরা ৫১ ভাগ।

নিম্নে ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০০০-২০০১ সাল পযন্ত প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ প্রদান করা হলো-

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

বছর	রাজস্ব	উন্নয়ন খাতে	মোট	শিক্ষাখাতে(শতকরা)হার
১৯৯৫-৯৬	৯৫০.৪	৭৮৯.৫	১৭৩৯.৯	৪৯.৪
১৯৯৬-৯৭	৯৯৮.২	৮০৫.৯	১৮০৪.১	৪৬.৯
১৯৯৭-৯৮	১১৪৭.৫	৬৮২.১	১৮২৯.৬	৪৩.৮
১৯৯৮-৯৯	১১৯৯.০	৮১৭.১	২০১৬.১	৪২.৭
১৯৯৯-২০০০	১৩১২.১	৯৩৬.৫	২২৪৮.৬	৪২.৯
২০০০-২০০১	১৩৭৮.৩	১১২২.৬	২৫০০.৯	৪২.৮

*১ কোটি=১০ মিলিয়ন

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের ১৫% শিক্ষা খাতে এবং শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের মধ্যে প্রায় ৬০% প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছে।[২৩]

২৩. Direrorate of Primary Education, Primary and Mass Education Division, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মেয়ে শিশু ও প্রাথমিক শিক্ষা
বর্তমান প্রেক্ষাপট

Dhaka University Institutional Repository

৫. মেয়ে শিশু ও প্রাথমিক শিক্ষা- বর্তমান প্রেক্ষাপটঃ

একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি শিক্ষা। উন্নয়ন ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা একদিকে মানুষকে যুগোপযোগী জ্ঞান আহরন ও তা প্রয়োগের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতি সাধনা করে। John Milton -এর ভাষায়, "Education is a harmonious development of body, soul and mind" অন্যদিকে শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক সহায়তা করে। অতএব মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা সুপ্ত মানসিকও শারিরীক গুনাবলী বিকাশে সহায়তা করে, মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলে। মানুষের সম্ভাবনার স্ফুরন ঘটিয়ে এক সময় যা অসম্ভব মনে হত তা সম্ভব করে তোলে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষকে সম্পদে পরিনত করে। তাই শিক্ষা নারী পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োজন। যদিও সমাজের সুষম উন্নয়নে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু উভয়েরই শিক্ষা দরকার কিন্তু এতদিন এ দেশের পুরুষ শাসিত সমাজে নারী শিক্ষার অগ্রাধান্যতা পায়নি। এ অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। দেশের জনগন বিশেষ করে নারী সমাজ প্রথাগত ভাবে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের শিকার। বর্তমানে অবশ্য এ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আরো উন্নতি প্রয়োজন।

৫.১. মেয়ে শিশুর অধিকার এবং আমাদের দায়িত্ব ঃ

মানুষের জীবনের শিশুকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। শিশুর জীবনে জন্মের পর থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে যা কিছু ঘটে, তা শৈশব ও কৈশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব ফেলে। তা সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ন সময়টিতে নারীর জন্য সমাজ নির্ধারিত কতগুলো নিয়মকানুন, অবহেলা, বঞ্চনা, দায়িত্ব ও কর্তব্য মেনে নিয়েই একটি কন্যা শিশু ছেলে শিশুর চেয়ে আলাদা হয়ে বেড়ে উঠে। অর্থাৎ মেয়ে শিশুটির বিকাশ তো রুদ্ধ হয়, পাশা পাশি পুরো জাতির আত্মনির্ভরীশলতা অর্জনের প্রয়াস নিদারুন ভাবে ব্যাহত হয়। তাই কন্যা শিশুদের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া এবং শৈশবের শুরুর বছরগুলোতে তাদের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মেয়ে শিশু ঃ

শিক্ষার অধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরম বৈষম্য বিরাজমান। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১৩০ মিলিয়ন বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর মধ্যে প্রায় ৮১ মিলিয়নই মেয়ে শিশু। প্রায় ৯৬০ মিলিয়ন বিশ্ব নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠির প্রায় দুই তৃতীয়াংশই নারী। বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে নিরক্ষরতার উচু হার নারীর অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে এবং সেই সাথে জাতীয় উন্নয়নের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিরাজ করছে।[১]

কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরন এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত সার্কশীর্ষ সম্মেলনে 'কন্যা শিশু বর্ষ' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৮৭ সালে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্কের নারী উন্নয়ন বিষয়ক বৈঠকেও শিশুদের ওপর গুরুত্ব উন্নয়ন বিষয়ক বৈঠকে ও শিশুদের ওপর গুরুত্ব আরোপ উপস্থাপন করা হয়। ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ১৯৯০ সালকে "সার্ক শিশু বর্ষ" হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের নভেম্বর মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত সার্কের পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলনে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দশকটি "সার্ক কন্যা শিশু দশক" হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশও যথাযথভাবে কন্যা শিশু বর্ষ এবং কন্যা শিশু দশক পালনে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়। ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে এই প্রথম বারের মত মেয়ে শিশুদের শিক্ষা ও অধিকারের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারূপ করা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলা যেতে পারে নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের নিরসন সহ তাদের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ও যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সরকাব আনুষ্ঠানিক ভাবে শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর কন্যা শিশু দিবস হিসেবে ঘোষনা দিয়েছেন। এ ঘোষনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়।[২]

---

১. ড. এম. এ. ওহাব, সেলিনা আখতার, ড. সুশীল কান্তি দে, নুসরাত সুলতানা, শিক্ষা ডিগ্রি স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,- EDM-1301, পৃষ্ঠা-১২২।

২. দৈনিক দিনকাল- কন্যা-শিশুর অধিকার, ৯ই আশ্বিন, ১৪০৯ বাংলা, ২৪শে সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃষ্ঠা-৬

Dhaka University Institutional Repository

৩. এছাড়া ধারনা করা হয় যে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা নারী পুরুষের অনুপাত ১০০ঃ১০৫। এশিয়ার অধিকাংশ দেশে এবং উত্তর আফ্রিকায় নারীর প্রতি বৈষম্য প্রকট। বৈষম্যের ফলে বিভিন্ন বয়সে পর্যাপ্ত পুষ্টি ও চিকিৎসা সেবার অভাবে নারী অকাল মৃত্যুর শিকার হয়। তাই দক্ষিন ও পশ্চিম এশিয়াতে এবং চীনে নারী পুরুষের অনুপাত ৯৪ঃ ১০০। অর্থাৎ অবহেলা, অপুষ্টি ও চিকিৎসাহীনতায় নারী মৃত্যুর হার অধিক। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার নারী পুরুষের অনুপাত ১০০ঃ১০৬।[৩]

৫.৩. বাংলাদেশে মেয়ে শিশু- জন্ম ও শ্রম সংক্রান্ত তথ্যঃ

জন্মলগ্ন থেকেই মেয়ে শিশুরা যে বৈষম্যের শিকার হয় তার প্রতিফলন ঘটে তাদের সামগ্রিক জীবনে। খাদ্যে, শিক্ষায়, কাজে চিন্তায়, স্বাধীনতায়, সম্পত্তির অধিকারে, সিদ্ধান্তে অংশ গ্রহনে সর্বত্রই মেয়েরা উপেক্ষিত।

- ছেলে শিশুদের চাইতে মেয়ে শিশুরা ২০% কম ক্যালোরি পায়।
- ১ থেকে ৪ বছর বয়সের মেয়েরা ছেলেদেব তুলনায় ১২% কম প্রোটিন পায়।

০-৪ বছর বয়সী কন্যা শিশুর সংখ্যা ৭.৭ মিলিয়ন (মোট জনসংখ্যার ১২.৬৬%)।
৫-৯ বছর বয়সী কন্যা শিশু ৯ মিলিয়ন (১৫.২৯%)
১০-১৪ বছর বয়সীরা হচ্ছে ৭.৭ মিলিয়ন (১২.৬%) এবং
১৫-১৭ বছর বয়সীরা মোট জনসংখ্যার ২.২৯%।

১৯৯৭ সালের হিসেব অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১২ কোটি ৫৩ লাখ। এর মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা (১০ থেকে ১৯ বছর) ২ কোটি ৭৬ লাখ। তারা জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে কিশোরীদের সংখ্যা ১ কোটি ৩৭ লাখ এবং কিশোরের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লাখ।[৪]

বয়সভেদে বাংলাদেশে মেয়েদের সংখ্যা

	৪-৫ বছর		৬-১০ বছর		১১-১৪ বছর		১৫-৪৫ বছর	
সন	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে
১৯৯০	৭.১৫৪	৩.৫৭৬	১৬.৬৭৯	৮.১৪৪	১০.৫৫৩	৪.৯৭৯	৪৬.১৮৪	২২.৭৮৩
১৯৯৫	৭.৮০৬	৩.৮৮৫	১৮.২৫৫	৮.৯১২	১১.২৫৭	৫.৩৬৯	৫২.৯২৮	২৬.১০১
২০০০	৮.৩৯৭	৪.১৬০	১৯.৬৯৭	৯.৬১৫	১১.৮৩৮	৫৩.৭০৯	৫৯.৮০০	২৯.৪৮২

উৎসঃ ব্যানবেইজ- মেয়ে শিশু ও শিক্ষা- ১৯৯৩।

৩. ইউনিসেফ, মেয়ে শিশু ও শিক্ষা, মডুল, পৃষ্ঠা-২-৩।
৪. দৈনিক দিনকাল, কন্যা শিশু অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ দেশের বেশির ভাগ কন্যা শিশুরা জন্মলগ্ন থেকেই অবহেলা ও উদাসিনতার মধ্যে বেড়ে উঠে। কন্যা শিশুর জন্মকে সাদরে গ্রহন না করার পিছনে যে সাধারন দৃষ্টি ভঙ্গি কাজ করে সেগুলো এ রকম-

- কন্যা শিশু পরিবারের শ্রম শক্তিতে কোনো যোগন দেয় না। সে অর্থ উপার্জনকারী নয়।
- অর্থ উপার্জনকারী নয় বলেই তার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিল্প বিষয়ে ব্যয় করা অযৌক্তিক।
- কন্যা শিশু হচ্ছে দায়-কারন তার বিয়ের সময় বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়।
- এই দৃষ্টিভঙ্গি গুলো যদি খতিয়ে দেখা যায়, তাহলে সম্পূর্ন ভিন্ন চিত্র বেরিয়ে আসতে পারে।
- ৫-১২ বছর বয়সী ও ১৩-১৯ বছর বয়সী কন্যা শিশুরা (স্কুল গামী সহ) দৈনিক নানান ধরনের গৃহস্থালী ও উপার্জনক্ষম কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন করে।
- ১০-১৪ বছর বয়সী কন্যা শিশুদের মধ্যে ২.৩ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৮% শিশু এবং ১৫-১৯ বছর বয়সী কন্যা শিশুদের মধ্যে ২.৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ৪৮% অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়।
- সামগ্রিক ভাবে কিশোরীদের ৩৬ শতাংশ উৎপাদনমূখী কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে।
- শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই গৃহপরিচারিকা হিসেবে ২ লাখ ২৫ হাজার নারী শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। এদের ৯০% এর বয়স ৯-১৬ বছর।

তাই কন্যা শিশু পারিবারিক শ্রম শক্তিতে কোনো কিছুই যোগ করেনা -এটি একটি ভ্রান্ত ধারনা। তাদের এই অবদান দুক্ষেত্রেই অবমূল্যায়িত হয়।

প্রথমতঃ সামাজিক ভাবেই কন্যা শিশুদের শ্রমক্ষেত্রে যে অবদান রয়েছে তা স্বীকৃত ও মূল্যায়িত নয়।
দ্বিতীয়তঃ কর্মক্ষেত্রেও তারা নানা ভাবে বৈষম্যের স্বীকার- তারা অন্যদের তুলনায় কম মজুরী পায় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়।[৫]

৫.৪. শিক্ষা ও মেয়ে শিশুঃ

কোনো একটি পরিবারে যদি কোনো কারনে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন দেখা দেয় তবে এ দৃশ্য সম্ভবত বিরল যে, কন্যা শিশুটি পড়াশুনা করছে ও ছেলে শিশুটি কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে হয় উভয়ের পড়াশুনা ব্যাহত হয় অথবা যদি কোনো শিক্ষা ব্যয় সংকুচিত করার কথা হয়- বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে কন্যা শিশুটির। এভাবে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের ভর্তির হার প্রায় সমান থাকলেও যতই উপরের দিকে যাওয়া হয় ততই মেয়েদের শিক্ষার হার ক্রমশঃই কমতে থাকে ও ঝরে পড়ার হার বাড়তে থাকে।

---

৫. দৈনিক দিনকাল, কন্যা শিশু অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নারী ও কন্যা শিশুরা শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার হার ৪৪.৩%। এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার ২৮.৩% ও পুরুষের শিক্ষার হার ৫০.৪%। অর্থাৎ নারী স্বাক্ষরতার হার পুরুষের স্বাক্ষরতার হারের প্রায় অর্ধেক।[৬]

প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এই বহুদূরের পথে মাত্র গুটি কয়েক ছাত্রী এ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। নিম্নে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া ছেলে মেয়ের অনুপাত প্রদান করা হলো-

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ের ভর্তির অনুপাতঃ

বছর	ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা			শতকরা হার	
	মোট	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
১৯৯৫	১৭২৮০৪১৬	৯০৯৪৪৮৯	৮১৮৯৬৬৮	৫২.৬	৪৭.৪
১৯৯৬	১৭৫৮০৪১৬	৯২১৯৩৫৮	৮৩৬১০৫৮	৫২.৪	৪৭.৬
১৯৯৭	১৮০৩১৬৭৩	৯৩৬৪৮৯৯	৮৬৬৬৭৭৪	৫১.৯	৪৮.১
১৯৯৮	১৮৩৬০৬৪২	৯৫৭৬৯৪২	৮৭৮৩৭০০	৫২.২	৪৭.৮
১৯৯৯	১৭২৬১৭১৩	৯০৬৫০১৯	৮৫৫৬৭১২	৫১.৪	৪৮.৬
২০০০	১৭৬৬৭৯৮৫	৯০৩২৬৯৮	৮৬৩৫২৮৭	৫১.১	৪৮.৯
২০০১	১৭৬৫৯২২০	৮৯৮৯৭৯৫	৮৬৬৯৪২৫	৫১.০	৪৯.০

সূত্রঃ Primary Education Statistics In Bangladesh-2001, Page-8

৬. দৈনিক দিনকাল, কন্যা শিশু অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত চার্টে দেখা যাচ্ছে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ভর্তির হার পূর্বে কম থাকলেও পর্যায়ক্রমে মেয়ে শিশু ভর্তির হার বেড়েছে। কিন্তু ছেলেদের ভর্তির হার কমেছে। নিম্নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লিঙ্গ ভেদে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা দেয়া হয়েছে-[৭]

শ্রেণী	২০০০			২০০১		
	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে
১ম শ্রেণী	৪৩৬৭০০৬	২২৮৬২৭৪	২০৪০৭৩২	৪২৭২১৭০	২১৭৩৮১৫	২০৯৮৩৫৫
২য় শ্রেণী	৩৮৫১২৫৯	১৯৭০৯১৪	১৮৮০৩৪৫	৩৯৪৪৯১০	২০২৩৪২৩	১৯২১৪৮৭
৩য় শ্রেণী	৩৫৪৬১৪৫	১৮০৪০৭৬	১৭৪২০৬৯	৩৫৯৪৩০৩	১৮২৪৭৮৯	১৭৬৯৫১৪
৪র্থ শ্রেণী	৩১২৯৩২৫	১৫৭৮৪২৬	১৫৫০৮৯৯	৩১৪৯৫৬৪	১৬০৯০৪৬	১৫৪০৫১৮
৫ম শ্রেণী	২৭৭৪২৫০	১৩৯৩০০৮	১৩৮১২৪২	২৬৯৮২৭৩	১৩৫৮৭২২	১৩৩৯৫৫১
মোট	১৭৬৬৭৯৪৫	৯০৩২৬৯৮	৮৬৩৫২৮৭	১৭৬৫৯২২০	৮৯৮৯৭৯৫	৮৬৬৯৪২৫

উৎসঃ Primary Education statistcs In Bangladesh-2001 (Page-5)

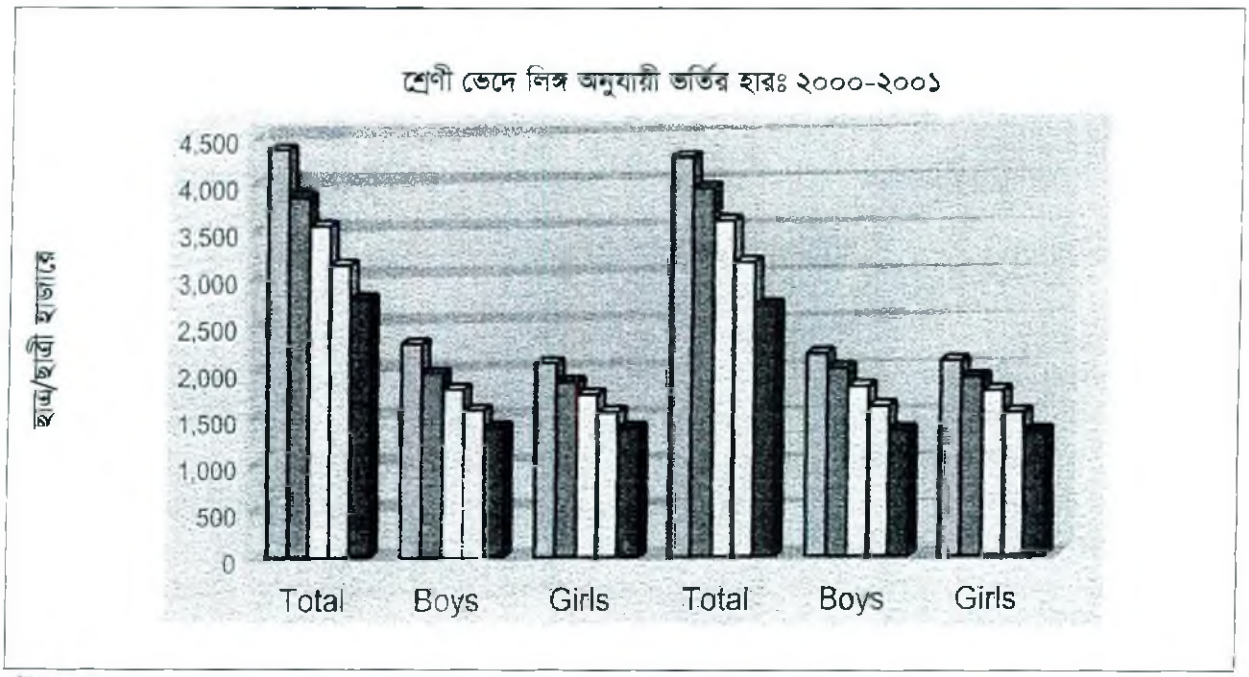

উৎসঃ Primary Education statistics In Bangladesh- 2001, Page-5

৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ- বিশ্ব শিশু সম্মেলনে লক্ষ্য মাত্রা অর্জন সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিবেদন-২০০০, প্রকাশ- ডিসেম্বর-২০০০, পৃষ্ঠা-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২০০১

বিদ্যালয়	শিক্ষক		ছাত্র/ছাত্রী		
	মোট	মহিলা	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
৩৭৬৭১	১৬২০৯০	৬১০০৮	১০৮৩০৭৪২	৫৪৬৬৮৯৯	৫৩৬৩৮৪৩

রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২০০১

বিদ্যালয়	শিক্ষক	ছাত্র/ছাত্রী		
		মোট	ছেলে	মেয়ে
১৯৪২৮	৭৭২৩৩	৪১৬৩৮৭৩	২১০৯০১৮	২০৫৪৮৫৫

(উৎসঃ Primary Education Statistics In Bangladesh-2001.)

আমাদের দেশে সাধারনতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনপোযোগী শিশুর বয়স ৬+ থেকে ১০+ পর্যন্ত থাকে। এদেশে ১৯.০২ মিলিয়ন বিদ্যালয়ে গমনোপোযোগী শিশুর মধ্যে ৯.৭৩ মিলিয়ন হচ্ছে মেয়ে শিশু। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের রেকর্ড অনুযায়ী মোট ভর্তিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী শিশু হচ্ছে ১৮.৩৬ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৯.৫৮ মিলিয়ন ছেলে এবং ৮.৭৮ মিলিয়ন মেয়ে। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট (GER) ভর্তি হার ৯৬.৫%। বিদ্যালয়ে অভর্তিকৃত ২০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলো বর্তমানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।[৮]

১৯৯০ সনে থাইল্যান্ডের জমটিয়েন এ অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন (ডব্লিউ সি ই এফ এ) এ প্রাথমিক শিক্ষার যে ধারনা তুলে ধরা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা তার সমতূল্য। হিসাব করে দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তি হার ১৯৯০ সনের ৮৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সনে প্রায় ৯৮% পৌছেছে।[৯]

---

৮. Quazi Afroz Jahan Ara- Situation Analysis of Primary Education in Bangladesh from Gender Perspective- Institute of Education and Research (IER) University of Dhaka, Page-3.

৯. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের চিত্রে তা দেখানো হলো-

বছর	৬-১০ বছর বয়সী শিশু		ভর্তি		মোট ভর্তি হার (%)	
১৯৯৬	৯৫০৬৭৭৫	৮৯৯৮৯২৬	৯২১৯৩৫৮	৮৩৬১০৫৮	৯৭%	৯৩%
১৯৯৭	৯৬৭৫৯৯২	৯১৮৫৫৯১	৯৩৬৪৮৯৯	৮৬৬৬৭৭৪	৯৭%	৯৪%
১৯৯৮	৯৭৬০৫৫০	৯৩১৯৩৩৮	৯৫৭৬৯৪২	৮৭৮৩৭০০	৯৮%	৯৪%
১৯৯৯	৯২৯৪৮২৬	৯০১২৪৩৯	৯০৬৫০১৯	৮৫৫৬৭১২	৯৮%	৯৫%
২০০০	৯৩৫১০৬২	৮৯৪৫২৫০	৯০৩২৬৯৮	৮৬৩৫২৮৭	৯৭%	৯৭%
২০০১	৯২৩৬৪৩২	৮৮৭৭৭৬৯	৮৯৮৯৭৯৫	৮৬৬৯৪২৫	৯৭%	৯৮%

(উৎসঃ Primary Education statistics In Bangladesh, Page-6)

'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৯০' বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের অনুকূলে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৯৯২ সন থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (পিএমইডি) এর প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ইতিবাচক ফল দিয়েছে। প্রদত্ত চার্টে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া 'সবার জন্য শিক্ষার' যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে যাত্রা শুরু করেছিল বাস্তবে যদিও তা লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে আরও বেশী অর্জিত হয়েছে কিন্তু পাঠচক্র সমাপ্ত করনের ক্ষেত্রে নিম্নহার দেখা গিয়েছে যা নিম্নে দেখানো হলো-[১০]

'সবার জন্য শিক্ষা' এর লক্ষ্য ও অর্জন (%)

	লক্ষ্য			অর্জন
	১৯৯১	১৯৯৫	২০০০	
মোট ভর্তির হার	৭৬%	৮২%	৯৫%	৯৬.৫%
সমাপ্তিকরন	৪০%	৫২%	৭০%	৬৫.০%

১০. Quazi Afroz Jahan Ara- Situation Analysis of Primary Education in Bangladesh from Gender Perspective- Institute of Education and Research (IER) University of Dhaka. Page-3.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত চার্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ের ভর্তির হার সঙ্গতিপূর্ন ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে যা খুবই ইতিবাচক একটি দিক। কিন্তু ১৯৯১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে মাত্র ৪০ ভাগ শিশু। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ঝরে পড়েছে। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে ভর্তি হওয়া শিশুদের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ঝরে পড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। যদিও মোট ভর্তি হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, অবশ্য অন্যদিকে নীট ভর্তি হার ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে বৃদ্ধি পেলেও ১৯৯৪ সনের পর থেকে তা ৮০% এর কাছাকাছিই রয়ে গেছে যা নিম্নে দেখানো হলো-[১১]

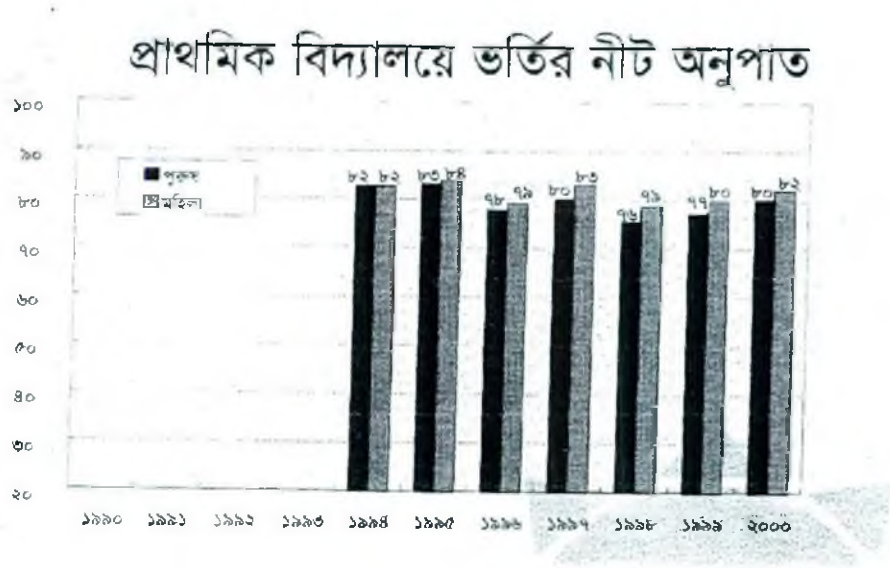

নীট ভর্তিহারের ক্রমধারায় একটি অপ্রত্যাশিত ধরন পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৪ সনের ৮২.৪৫ থেকে হ্রাস পেয়ে ভর্তি হার ২০০০ সনে ৮০.৯% এ নেমে আসে। ১৯৯৪ সন থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত সময়ে ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই নীট ভর্তিহার কমেছে। তবে বিগত বছর গুলোতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ন শিক্ষার্থীদের হার ১৯৯০ সনের ৪২.৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সনে ৭০.৩% এ পৌঁছেছে। নিম্নে একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো-[১২]

১১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬, ৫৩।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা-২৭,৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম শ্রেণীতে পৌঁছানো শিশুঃ

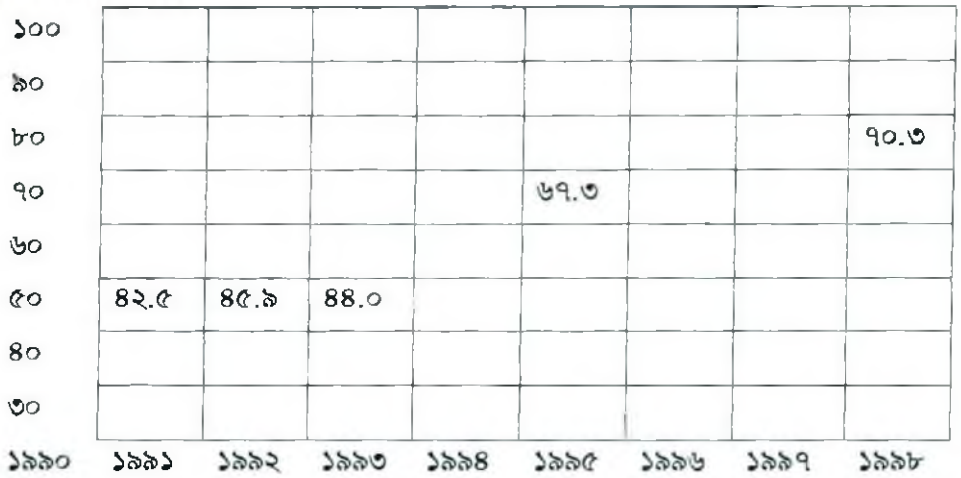

পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ণ ছেলে শিক্ষার্থীদের হার ১৯৯০ সনের ৪২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সনে ৬৯.১% এ পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ১৯৯০ সনের ৪২% থেকে ১৯৯৮ সনে ৬৬.৭% এ পৌঁছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের আরেকটি ইতিবাচক সূচক হলো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি হারের বৃদ্ধি। ১৯৯৪ সন থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত সময়ে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪.৪% থেকে ৭২.৪% উন্নিত হয়েছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৯৯৪ সনে এই হার ছিল প্রায় ৬৩% ও ১৯৯৭ সনে ৭১% এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৯৯৪ সনে ছিল ৬৬% ও ১৯৯৭ সনে ৭৪.৭%।[১৩]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি হার

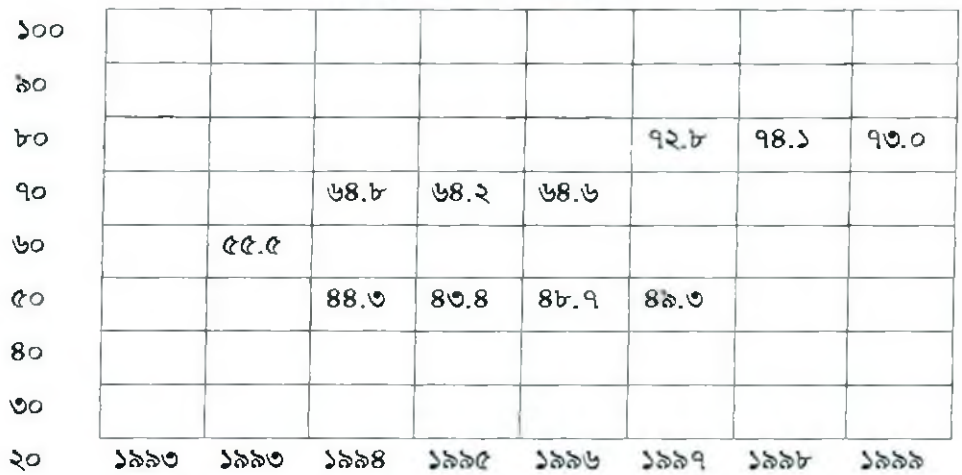

- এম আই সি এস,বি বি এস/ইউনিসেফ (গত তিন দিনের উপস্থিতি)
- বাৎসরিক মনিটরিং রিপোর্ট ডিপিই (গড় উপস্থিতি) (অপ্রকাশিত)

১৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের প্রতি নানা অবহেলা ও বৈষম্য থাকলেও মেয়েরা এখন যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে-

- ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৮১% প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন বা নন ফরমাল বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কন্যা শিশুদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন ও ছেলে শিশুদের মধ্যে শতকরা ৮১ জন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভর্তি হয়।
- একজন শিশুর দশবছর বয়সের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম তথা পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ন হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায় ১১-১৫ বছর বয়সীদের এক তৃতীয়াংশ এমনকি ১৬-২০ বছর বয়সীদের একাংশ ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হয়। আবার উপবৃত্তির লোভে ৬+ এর কম বয়সের শিশুকেও ১ম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়।

বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি এগিয়ে আছে। শতকরা ৭৫ জন কন্যা শিশু স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত হয়, যেখানে ছেলে শিশুর উপস্থিতি শতকরা ৭১ জন।

এখানে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি করন ও ঝরে পড়ার হার দেয়া হলো-

পাঁচবছর শিক্ষা সমাপ্তিকরন ও ঝরে পড়ার হার

বছর	সমাপ্তিকরন (%)	ঝরে পড়ার হার (%)
১৯৯১	৪০.৭	৫৯.৩
১৯৯৪	৫১.৩	৩৮.৭
১৯৯৫	৫২.০	৩৮.০
১৯৯৮	৬৫.০	৩৫.০
১৯৯৯	৬৫.০	৩৫.০
২০০০	৬৭.০	৩৩.০
২০০১	৬৭.০	৩৩.০

(সূত্রঃ Primary Education statistics In Bangladesh- 2001, Page- 10.)

Dhaka University Institutional Repository

উপরে চার্টে দেখা যাচ্ছে- ১৯৯১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ শিশু। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ঝরে পড়েছে। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করছে ভর্তি হওয়া শিশুদের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ঝরে পড়ছে শতকরা ৪০ ভাগ। বর্তমানে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যালয়ে পাঠচক্র সমাপ্তি করনে ২০০১ সালে প্রায় ৭০ ভাগে উন্নীত হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার শতকরা ৩৩ ভাগে নেমে এসেছে।[১৪]

এছাড়া 'সবার জন্য শিক্ষা' ২০০০ এ লক্ষে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত নানা পদক্ষেপের সালে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হলেও বিভিন্ন। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করছে, যা প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই ঝরে পড়ার কারনে এ কর্মসূচী যে নীরব সাফল্য অর্জন করছিল তা কিছুটা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। নিম্নের চার্টে শ্রেণী ও লিঙ্গভেদে ছেলে ও মেয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পূনরাবৃত্তি, ভর্তি এবং ঝরে পড়ার হার দেখানো হলো।

শ্রেণী/লিঙ্গ	শিক্ষার্থীর শতকরা হার				শিক্ষার্থীর সংখ্যা
	বর্ধিত	ঝরে পড়া	পূনরাবৃত্তি	মোট	
মেয়ে					
প্রথম	৮৭.৬	৫.৪	৭.০	১০০	১৮৬০০
দ্বিতীয়	৯০.৫	৪.৬	৪.৯	১০০	১৬৩৭১
তৃতীয়	৮১.৮	৭.২	১১.০	১০০	১৫১৪২
চতুর্থ	৮৫.৩	৫.৭	৯.০	১০০	১২৯৪৯
পঞ্চমশ্রেণী	৮৯.৪	৪.৬	৬.০	১০০	১০৭৩৫
সমস্ত বালিকা	৮৬.৯	৫.৫	৭.৬	১০০	৭৩৭৯৭
ছেলে					
প্রথম	৮৬.৪	৫.৬	৮.০	১০০	১৯৫২৬
দ্বিতীয়	৮৯.৬	৪.৪	৬.০	১০০	১৭১১২
তৃতীয়	৮২.০	৬.৮	১১.২	১০০	১৫৫৬৯
চতুর্থ	৮৩.২	৭.২	৯.৬	১০০	১৩০১৭
পঞ্চমশ্রেণী	৮৮.২	৪.৭	৭.১	১০০	১১০৫৩
সকল ছেলে	৮৬.০	৫.৭	৮.৩	১০০	৭৬২৭৭

১৪. অগ্রযাত্রা- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারনী থেকে দেখা যায় যে, শ্রেণী ওয়ারী ঝরে পড়ার হারের পার্থক্য শতকরা ৪ থেকে শতকরা ৭ ভাগ এবং পূনরাবৃত্তির পার্থক্য শতকরা ৪ থেকে শতকরা ১১ ভাগ। ১৯৯৯ সনে প্রকাশিত Education Watch কর্তৃক এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলে মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২৬.৬ ভাগ মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করেই ঝরে পড়ে। পাশাপাশি শতকরা ২৮ ভাগ ছেলে ঝরে পড়ে। উক্ত সমীক্ষার আলোকে দেখা যায় যে, মেয়ে শিশুর ঝরে পড়ার হার ছেলে শিশুর চেয়ে কম।[১৫]

১৫. Quazi Afroz Jahan Ara, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪-৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ মেয়ে শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমানে আর্থ-সামাজিক সমস্যা জনিত সমস্যা সমূহঃ

মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে যা সকল সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

❑ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারনে নারী পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে সমাজে কিছু গতানুগতিক ধারনা প্রচলিত রয়েছে। যেমন-

- বৃদ্ধ বয়সে ছেলে সন্তান বাবা মাকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিবে।
- ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের তুলনায় মূল্যবান।
- পরিবারের আয় রোজগারের দায়িত্ব পুরুষের।
- মেয়েরা বিয়ে হলে অন্য পরিবারে চলে যাবে। তাই তারা ছেলেদের শিক্ষার উপর বেশী জোর দেন এবং টাকা খরচ করেন।
- অনেক মা-বাবা ভাবেন তারা যে ভাবে সুযোগ সুবিধা পেয়ে এসেছেন সে ভাবেই গড়ে উঠবে তাদের ভবিষৎ প্রজন্ম।
- মা-বাবা মনে করেন ছেলেরা ভবিষ্যতে তাদের দেখাশুনা করবে।
- মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতেই হবে এটা মা-বাবা মনে করেন ফলে লেখাপড়ার জন্য অর্থ খরচ না করে যৌতুকের জন্য জমানোর প্রয়োজন বলে মনে করে।
- বাবা-মা/অভিভাবকরা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মূল্য ও মর্যাদা কম দিয়ে থাকে।
- মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়লে পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে এবং তারা বহুমূখী হবে এমন ভীতি অনেক পরিবারে কাজ করে।
- মেয়েরা ঘরের কাজ করবে, সংসার দেখাশুনা করবে অর্থাৎ মেয়েদের চিরাচরিত ভূমিকার প্রতি অভিভাবকদের অগাধ বিশ্বাস এবং স্কুলে পাঠাতে অনীহা।
- মা-বাবা মনে করেন মেয়ের বিয়ে দেয়া তাদের প্রধান কর্তব্য। লেখাপড়া শেখানো পরবর্তী কর্তব্য।
- মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় এবং অর্থ ব্যয়কে অপচয় মনে করা।
- মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক উদাহরন সৃষ্টিকারী ভূমিকার অভাব।
- সামাজিব নিরাপত্তার অভাবে বাবা-মা মনে করেন মেয়েদের যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া যায় ততই ভাল। তবে তারা এও মনে করেন যে, যদি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের পড়ানো যায় তবে ভাল স্বামী পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

❑ Opportunity cost এর অভাবঃ

শিক্ষার সুযোগ গ্রহনের ব্যয়ের (Opportunity cost) অভাব মেয়েদের শিক্ষার আরেকটি প্রতিবন্ধকতা। অনেক সমাজে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে শিশু শ্রমের চাহিদা আছে। ফলে বাবা-মা দারিদ্রের কারনে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে গৃহের ও বাইরের কাজে নিয়োজিত করাকে অধিক লাভজনক মনে করে। এ লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে তারা মেয়ে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠায় না।

❑ বিদ্যালয়ের দূরত্বঃ

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দূরত্বের কারনে অভিভাবকের নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। ফলে মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দূরে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার সময়কে সময় অপচয় মনে করা হয় বলে মেয়েদেরকে গৃহকর্মে নিয়োজিত করা হয়।

- 'বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' তে নারী প্রতিনিধিত্বকারীর সংখ্যা খুবই কম।
- ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সুযোগ খুব সীমিত।
- মহিলা প্রধান শিক্ষিকার সংখ্যা কম।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। অর্থাৎ প্রায় ৩০ ভাগ এর মতো।

❑ শিক্ষাক্রমে মেয়েদের চাহিদার প্রতি গুরুত্বের অভাবঃ

অনেক সময় শিক্ষাক্রমে মেয়েদের চাহিদা ও প্রয়োজন যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হয় না। আবার অনেক সময় যথাযথ প্রশিক্ষনের অভাবে শিক্ষক মেয়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রতি নজর না দিয়ে ছেলে শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেয়। ফলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় না এবং পড়ালেখা ছেড়ে দেয়। বর্তমানে এনসিটিবি শিক্ষাক্রম থেকে ছেলে মেয়েদের বৈষম্য অনেকটাই দূর করেছে।

- বেশির ভাগ মেয়ে শিশুরই পড়াশুনা করে স্বাবলম্বী হবার মত কোন স্বপ্ন থাকে না।
- সহশিক্ষা (Co-Education) বিদ্যালয় সহ শিক্ষায় মেয়েদের পাঠানোর ব্যাপার অভিভাবকদের অনীহা।[১৬]

---

১৫. ড. এম. এ. ওহাব, সেলিনা আখতার, ড. সুনীল কান্তি দে, নুসরাত সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২২-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ-

- বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটারী/পায়খানার ব্যবস্থা না থাকা।
- বাবা-মা এমন কি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও মনে করেন যে মেয়েরা কোন মতে পাশ করলেই হবে। কিন্তু ছেলেদের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে হবে।
- শিক্ষকরা মনে করেন ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী মেধাবী এবং শিক্ষিকারাও তা বিশ্বাস করেন।
- বাবা মা/অভিভাবক-রা মানসম্মত লেখাপড়া বলতে কি বোঝায় তা জানেন না বা তার সম্বন্ধে কোন উৎসাহ নেই।
- পরিবারে যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাবা পারিবারিক গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে পরিবারে মহিলাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অংশগ্রহন করতে পারে না।
- মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে না যাওয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ন কারন হচ্ছে অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া।
- মেয়েরা স্কুলে যাবার আগে ও স্কুল থেকে আসার পর পরিবারের কাজ করতে হয়। ফলে তারা পড়াশুনার সময় কম পেয়ে থাকে।
- যদিও মেয়েদের লেখাপড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ফ্রি, কিন্তু অনেক মা-বাবা বলেন স্কুলের বেতন ছাড়াও আরও অনেক ধরনের খরচ থাকে -যেমন, কাপড় চোপড়, খাতা কলম, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি। এটা বহন করা অনেকের জন্য কষ্টকর।
- মা-বাবা মেয়ে সন্তানকে স্কুলে পাঠাবার চেয়ে গৃহকর্মে অর্থাৎ পানি আনা, ঘর গোছানো, জ্বালানী সংগ্রহ ও ছোট ভাই-বোনদের লালন পালনের জন্য ঘরে আটকে রাখাটা জরুরী বলে মনে করেন।
- শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধরেই নেন যে গণিত ও বিজ্ঞানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দক্ষতা কম।
- মহিলা শিক্ষক তুলনামূলক ভাবে কম যা মেয়ে শিশুদের স্কুলে যেতে নিরুসাহিত করে।
- শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অধিকাংশই ছবির অলংকার বা উদাহরন ছাত্র-ছাত্রীদের সমানভাবে উৎসাহিত না করা (যেমনঃ ছবিতে একটি ছেলে বই হাতে তার বাবার সাথে বাজারের পথে স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু একটি মেয়ে শিশুকে দেখানো হচ্ছে তার মায়ের সাথে ঘরের কাজে সাহায্য করছে)।
- পাঠ্য বইগুলোতে ভাষা, অলংকার, পরিবেশ পরিস্থিতি ব্যাখায় জেন্ডার বৈষম্য।
- স্কুলে মেয়েদের প্রতি আচরনে বৈষম্য। শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত কোন দলীয় কাজে সাধারনত ছাত্র এবং ছাত্রীরা আলাদাভাবে অংশগ্রহন। যেমন ছেলেরা মাটি কেটে গর্ত ভরাট করছে। মেয়েরা শ্রেণীকক্ষ পরিস্কার করছে)। তাছাড়া শ্রেণী কক্ষে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রেও শিক্ষকরা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষা পাঠ্যসূচীর চারু ও কারুকলা এবং সংগীত বিষয়গুলি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত পক্ষান্তরে ছেলেদের জন্য থাকে কারিগরি শিক্ষা ও খেলাধুলা ইত্যাদি।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে মেয়েদের বিশেষ করে নারীদের গতানুগতিক পরনির্ভরশীল ও গৃহস্থালির কাজের ভূমিকাকে মহিমান্বিত করে চিত্রিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

- মেয়েদের চাইতে ছেলেদের প্রতি শিক্ষকদের অধিক মনোযোগ জেন্ডার বৈষম্যহীন উপকরণের অভাব।
- শিক্ষার্থী বালক ও বালিকাদের প্রতি শিক্ষকদের ভিন্ন ভিন্ন আচরন।[১৭]

৫.৭. সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করনে বর্তমান বাধাসমূহ

- অনেক অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠিয়ে তেমন কোন লাভবান হয় না বলে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখান না।
- পড়াশুনা করার ফলে শিশুদের জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে সেটাও অভিভাবকরা অনুধাবন অনেক সময় করতে পারেন না।
- স্বল্প আয় সম্পন্ন পরিবারগুলো জানেনই না যে তাদের শিশুরা কোন শ্রেণীতে পড়ে।
- অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত অনেক অভিভাবকরা, বিশেষ করে অভিভাবকরা মেয়ে শিশুদের পড়াশুনার ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন না।
- একটি মেয়ে শিশুর জীবনে পড়াশুনার চাইতে বিয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ন। অভিভাবকরা ভালো ফলাফলের চাইতে মেয়েদের শুধু মাত্র যাওয়া আসাকেই বেশী গুরুত্ব দেয়।
- ছাত্র, অভিভাবক এমনকি এলাকাবাসীর শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নেব জন্য কি করা উচিত বা তাদের ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে সচেতন নন।
- স্কুলে কি পড়ানো হচ্ছে তা সম্পর্কে অভিভাবক বা এলাকাবাসীদের কোন উৎসাহ নেই। এলাকাবাসীরা মনে করেন স্কুল পরিচালনা করা সরকারের দায়িত্ব।
- সামাজিক মোবিলাইজেশন ও কমিউনিকেশন কর্মসূচীকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে না।
- শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এস,এম, সি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্লাশরুমে তেমন কোন শিক্ষা উপকরন দেখা যায় না।
- বিদ্যালয় এবং শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নেব ক্ষেত্রে এলাকাবাসী, ও এস, এম, সি সদস্যদের সচেতনতার অভাব।
- এস, এম, সি সদস্যরা স্কুল মিটিং গুলোতে ঠিকমত উপস্থিত হয় না।
- এস, এম, সি সদস্যরা মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ের ভিতরের ও বাইরেব সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নয়।
- বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরনের অভাব।
- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না।
- কাজের চাপের কারনে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকরা সময় ব্যয় করতে চান না।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য তেমন কোন ইচ্ছা বা আগ্রহ শিক্ষকদের মধ্যে দেখা যায় না।[১৮]

400840

---

১৭. ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, প্রাথমিক শিক্ষার মানউন্নয়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও একাডেমীক সুপার ভিশন, প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০০১ উপলক্ষে জাতীয় সেমিনার, পৃষ্ঠা-১৭-১৮।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা-১৯-২০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮. প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়ঃ

বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা যেতে পারেঃ

- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য গণসংযোগ ও প্রচার মাধ্যমে ব্যবহার করা।
- বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার, স্বল্প দৈর্ঘ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, গণসংযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জারীগান ও নাটকের আয়োজন করে গনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- মেয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদা ভিত্তিক বিদ্যালয় কর্মসূচী প্রনয়ন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ।
- নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।
- সমাজের কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যালয় কর্মকান্ডে সমাজ ও অভিভাবকের অংশ গ্রহন বৃদ্ধি।
- প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্রম প্রনয়ন।
- যাতায়াত ও হোষ্টেলের ব্যবস্থাকরন।
- শিক্ষকদের জেন্ডার বিষয়ে অবহিতকরনের জন্য প্রশিক্ষন প্রদান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার পরিদর্শন ও পরিবীক্ষনে জেন্ডার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান।
- মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয়ে যথাযথ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি।
- পাঠ্যক্রম আকর্ষনীয়করনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তোলা।
- সর্বোপরি শিক্ষার বিষয়বস্তুতে জেন্ডার বিষয়টি যথাযথ সম্পৃক্ত করনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নারী পুরুষের বৈষম্যের বিভিন্ন দিক ও সেগুলো দূরীকরনের উপায় সম্পর্কে অবহিত করে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরন করা যেতে পারে।[১৯]

---

১৯. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০০১, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯. প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ-

মেয়েদের শিক্ষাহীনতা সমাজ জীবনে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গিয়েছে, যে কোন উন্নয়নে বিনিয়োগের তুলনায় নারী শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায়। কেননা শিক্ষা না থাকলে কাজ করবার যোগ্যতা কম থাকে, ফলে পরিবারের উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না। মা হিসেবে সফল হবার সম্ভাবনা কম থাকে। ক্ষীনস্বাস্থ্য, পুষ্টিহীনতা, নিম্নমানের পয়ঃপদ্ধতি ব্যবহার- ইত্যাদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারন মেয়েদের উন্নততর জীবনের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়। এ সব আবার মা ও শিশু মৃত্যুর পরোক্ষ কারন হিসেবে কাজ করে। শিক্ষাই কেবল এ অবস্থা থেকে মেয়েদের মুক্তি দিতে পারে।

৫.৯.১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপঃ

আমাদের দেশে নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতার কারন সমূহ দূর করার জন্য বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদিতে নারীর উন্নতি, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির ওপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। নিম্নে নারী ও মেয়ে শিশুর শিক্ষার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গুলো বর্ননা করা হলোঃ

❖ **শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ সৃষ্টিঃ**

ক) স্যাটেলাইট স্কুলঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীতে ভর্তিযোগ্য শিশুদের বাড়ীর দোরগোড়ায় স্কুলগৃহকে নিয়ে আসার লক্ষ্যে স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূল বিদ্যালয়ের দূরত্ব,প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং যাতায়াতের প্রতিকূলতার কথা বিবেচনা করে মূল স্কুলকে কেন্দ্র করে স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। শিশুরা একই বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে নিকটবর্তী মূল বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এ পর্যন্ত ৪,১৪২টি স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্থানীয় ব্যবস্থাপনা-কমিটির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত শিক্ষিকার দ্বারা স্যাটেলাইট স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। সরকার শিক্ষকদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে সম্মানী প্রদাকন করে থাকে। ভবিষ্যতে এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) কমিউনিটি স্কুলঃ

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকার স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি স্কুল পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করেছে। স্থানীয় জনগণের প্রদত্ত জমিতে সরকার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাসহ এসব স্বল্পব্যয়ী বিদ্যালয় নির্মান করেছে। লোকাল কমিউনিটি শিক্ষক নিয়োগ ও স্কুল পরিচালনা করে থাকে।

গ) রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুদান প্রদানঃ

স্থানীয়ভাবে পরিচালিত রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবকার অনুদান প্রদান করে থাকে। শিক্ষকদের অনুদান হিসাবে মূল বেতনের সর্বোচ্চ ৯০% প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘ) প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী প্রচলনঃ

পল্লী এলাকার স্কুলগুলোতে বিদ্যালয় গমনোযোগী নয় এমন শিশুরা (৬ বছর বয়সের নীচের) বিদ্যালয়ে ভীড় করে। তাছাড়া শিশুদের স্কুলে আসার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালু করার ব্যাপারে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে।

ঙ) শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদানঃ

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র। দরিদ্র পরিবারেব পিতামাতারা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে হয় উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত রাখে। এছাড়া বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদী চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রানের লক্ষ্যে প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে দরিদ্র পরিবারকে তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরনের জন্য সহায়তা প্রদানকল্পে গ্রহন করা হয়েছিল "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী"। এ কর্মসূচীকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০২ সালের জুলাই থেকে খাদ্য শস্য (গম/চাল) প্রদানের পরিবর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং এ লক্ষ্যে নতুন "উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করেছে"। যথা-

- দরিদ্র পরিবারের এক সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরনের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং
- একাধিক সন্তানের জন্য ১২৫ টাকা দেয়া হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে নির্বাচিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। প্রতি বছর ৬৬৩ কোটি টাকা এ লক্ষ্যে ব্যয় করা হবে, যা সরকার নিজস্ব উৎস হতে সংস্থান করবে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী সকল ইউনিয়ন (পৌর ও মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতিত) ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক এই বৃত্তির সুবিধা ভোগ করবে। একর্মসূচী বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর স্কুলে ভর্তি হার বৃদ্ধি পাবে, ঝড়ে পড়া হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার গুনগতমান ও উন্নত হবে। এছাড়া-

- গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।
- কোন পরিবারে যদি একমাত্র সন্তান কন্যা হয় তাহলে তার শিক্ষা স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক।
- মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের বৃত্তি দেয়া হয়।

চ) বিদ্যালয় আকর্ষনীয়করন কার্যক্রমঃ

১৯৯১-৯৭ মেয়াদে সাধারন শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম চালু করা হয়। স্থানীয় এনজিও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রমের বিশেষত্ব ছিল দরিদ্র শিক্ষার্থী বিশেষ করে ছাত্রীদেরকে শিক্ষোপকরন, স্কুল ইউনিফর্ম প্রদান, পাঠাগার স্থাপন ও ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ ইত্যাদি। স্কুলে উপস্থিতি, মেধা বিচার, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় যোগ্যতা বিচার ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কুলকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষনীয় করে তোলা হয়। সামাজিক সম্পৃক্ততা এই কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ন উপাদান। প্রতি মাসে প্রতি স্কুলের জন্য ২০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রম যে সমস্ত এলাকায় চালু করা হয়েছে সেই সমস্ত এলাকার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝড়ে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ছ) প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারী সংস্থার অংশগ্রহনঃ

১৯৯১-৯৭ মেয়াদ সাধারন শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীন স্কুল বহির্ভূত এবং স্কুলত্যাগী শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এনজিওদেরকে অনুদান প্রদান করে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় ৩০০০ উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। ঐ সময়ে ১৭ টি এনজিও এ কার্যক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। অধিদপ্তরের অধীনে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে যথাক্রমে বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস। প্রতিটি উপজেলায় ২০-৩০টি স্কুল নিয়ে গঠন করা হয়েছে একটি ক্লাষ্টার। প্রতি ক্লাষ্টারের দায়িত্বে আছেন একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষনের নবতর ধারনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে প্রতি ক্লাষ্টারকে কতিপয় সাব-ক্লাষ্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। এভাবে তৃনমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কাঠামো ক্রিয়াশীল রয়েছে।

❖ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ণ পরিবীক্ষন ইউনিটঃ

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষন করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কাজ। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্ধারিত হারে মাসিক অনুদান প্রদান করা হয়।

❖ সামাজিক সম্পৃক্ততাঃ

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও গুনগতমান নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় জনসমর্থন অত্যাবশ্যক। জনসমর্থন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেঃ

ক) স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গঠনঃ

সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনার জন্য প্রতিটি স্কুলে একটি করে স্বতন্ত্র স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়। স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে এই কমিটিকে কিছু দায়-দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি করে অভিভাবক- শিক্ষক সমিতি গঠন করা হয়। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এ কমিটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য ১৩,৩৮০ টি ওয়ার্ড কমিটি, ৪,৪৫০ টি ইউনিয়ন কমিটি , ৪৮১টি উপজেলা কমিটি এবং ৬৪টি জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। এসব কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়। স্যাটেলাইট ও কম্যুনিটি স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য বিতরন ও স্কুল আকর্ষনীয়করন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনঃ

শিক্ষন, প্রশিক্ষন, তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রয়াসে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষাধারায় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একনিষ্ঠ সাধনায় বিকশিত হচ্ছে শিক্ষার্থী মেধা, মনন এবং সামগ্রিকভাবে জীবন। তাদের মেধা, শ্রম এবং সাংস্কৃতিক প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ এদেরকে পুরস্কৃত করার লক্ষে তাই প্রতি বছর পালন করা হয় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। এ উপলক্ষে আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, দেশাত্মবোধক গান, একক অভিনয়, অংকন, নৃত্য, কাব স্কাউটিং প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা শিশু, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষিকা, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক ম্যানেজিং কমিটি, সর্বোচ্চ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতিবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত বালক-বালিকাকে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয়।

গ) প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ উদযাপন ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণঃ

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার আন্দোলনকে সামাজিকীকরন করার সুচিন্তিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ উদযাপন করা হয়। শিক্ষা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিনামূলে পাঠ্যপুস্তক বিতরন, শিশুদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান, শিশু জরীপের ফলাফল প্রকাশ, শিক্ষোপকরন প্রদর্শন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের জনগনকে সরকারী প্রচেষ্টায় অংশীদার হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় এলাকার সাধারন মানুষের পরস্পরের মত বিনিময় হয় এবং সৌহার্দ্যপূর্ন সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

ঘ) গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারনাঃ

বর্তমানে অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে শিক্ষা সম্প্রসারনেব ক্ষেত্রে গণ-মাধ্যমের গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। তাই প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। পোষ্টার, অডিও, ভিডিও এবং সংবাদপত্রসহ নানা মাধ্যমকে এজন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ 'সবার জন্য শিক্ষা' একটি জনপ্রিয় স্লোগানরূপে আজ সর্বত্র দৃশ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

❖ প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নঃ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তিযোগ্য অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষাধারায় সম্পৃক্ত হয়েছে কিন্তু গুনগত দিক থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, শ্রেনীভিত্তিক শিখন যোগ্যতাগুলো সকল শিশু যথাযথভাবে অর্জন করতে পারছে না। শ্রেণীভিত্তিক শিখন যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে অর্জন করতে না পারার পিছনে যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষাক্রম, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও শিক্ষক প্রশিক্ষনের আধুনিকায়নের অভাব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে দায়বদ্ধতা, যোগ্যতার স্বল্পতা ও আন্তরিকতার অভাব। তাই, শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমনঃ

ক) শিক্ষাক্রম উন্নয়ণঃ

দেশ, কাল, সমাজ ও জাতির যুগোপযোগী চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম রচিত হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমন্বয়ে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চাহিদার প্রকৃতি যায় বদলে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, নারীশিক্ষা, পরিবেশ তথা বিজ্ঞানময় বর্তমান জীবন এবং একবিংশ শতাব্দীর তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সময়কে ঘিরে রচিত হয়েছে আমাদের দেশের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তকসমূহ। দেশ, কাল ও সময়ের দাবী মেটাতে ও শিক্ষাক্রম সক্ষম বলে আশা করা যায়।

খ) পেশাগত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিঃ

দক্ষ জনশক্তি ব্যতীত কোন সংগঠনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেশ ও জাতির সেবা করা সম্ভব হয় না। আর পেশাগত কাজে দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন ছাড়া দক্ষ জনশক্তি সংগঠিত হয় না। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারেব সুবিশাল কর্মকান্ডের সংগে যারা জড়িত, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠদান কলাকৌশল, ব্যবস্থাপনার, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে নবতর ধ্যান-ধারনার উদ্ভব হচ্ছে তাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এ ব্যাপারে যথাযথ প্রশিক্ষন প্রদান কার্যক্রম গ্রহনের ফলে বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগসহ তার অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর ও পকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ পেশাগত জ্ঞানে আজ সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

গ) শিক্ষক প্রশিক্ষনঃ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষন বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন চাহিদা নিরূপন, পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। অধিদপ্তরাধীর বিভিন্ন ধরনের পেশাগত প্রতিষ্ঠান যেমনঃ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ৫৪টি পিটি আই, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং ক্লাষ্টার পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষনের আর্থিক যোগান ও সমন্বয় সাধন করে। বর্তমানে শিক্ষকদের জন্য পিটিআই ভিত্তিক সি-ইন-এড, এম ডব্লিউ টি এল, সাব-ক্লাষ্টার এবং চাকুরীকালীন বিভিন্ন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষন চালু আছে।

ঘ) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)ঃ

ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ন অবদান রেখে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার সংগে জড়িত মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে। ১৯৯৩ হতে ২০০১ সময়কালে একাডেমী প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৪,৫০৮ জন কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের লক্ষ্যেও একাডেমী বিভিন্ন গবেষনামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষন ও গবেষনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ও প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

১) পিটিআই প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষন, সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম প্রনয়ন এবং সি-ইন-এড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন।

২) সি-ইন- এড কারিকুলাম উন্নয়ন।

৩) সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়দের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪) নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা।

৫) প্রশিক্ষনোত্তর মনিটরিং, ফলোআপ ও ফিডব্যাক লাভের মাধ্যমে প্রশিক্ষনের আরো উন্নয়ন ঘটানো।

৬) এ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা।

১৯৯৭ হতে ২০০০ সালের মধ্যে একাডেমী নিম্নে বর্নিত সমীক্ষা ও গবেষনা কার্যক্রমগুলি সমাপ্ত করেছেঃ

১) 'বানাইল মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়' একটি সমীক্ষা।

২) তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের বিয়োগ অংকে দুর্বলতার কারন অনুসন্ধান।

৩) সরকার ও এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিখন-ক্ষমতার তুলনামূলক মান নিরূপন।

৪) সি-ইন-এড কোর্সের আনুষঙ্গিক কার্যাবলী বাস্তবায়ন অবস্থা নিরূপন।

Dhaka University Institutional Repository

৫) সাব-ক্লাষ্টার প্রশিক্ষন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা নিরূপন।

৬) নির্বাচিত কতিপয় মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর উপর সমীক্ষা।

৭) সি-ইন-এড কোর্সের PTI সমীক্ষা 'A Study on post-training Utilization for C in Ed. Training Course.

৮) পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ক যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নিরূপন।

৯) Profile of Model Primary School.

১০) বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান হতে 'দুই শিফট বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এক শিফটে রূপান্তরিত করার ফলাফল নিরূপন' বিষয়ে গবেষনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্পতি এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে আরো দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় এবং এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয় তজ্জন্যে এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

একাডেমী 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে নিউজ লেটার টইপ একটি সচিত্র অর্থবার্ষিক পত্রিকাও নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষনা সারসংক্ষেপ, নিয়োগ-বদলী ইত্যাদি বই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঙ) মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

১৯৯৪ সনে দেশের প্রতিটি উপজেলা সদরে অবস্থিত অধিকতর ভৌত সুবিধা, ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কক্ষ বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে ৪৮১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মডেল স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবতর আঙ্গিকে মডেল স্কুলে শিক্ষক, আসবাবপত্র, স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপোকরন, খেলাধুলার সরঞ্জাম কাবদল গঠনের সুবিধাদি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মডেল স্কুলকে একটি অনুসরনযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সব ধরনের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহ কর্তৃক মডেল স্কুলের সকল প্রধান শিক্ষকদের 'বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যালয় আকর্ষনীয়করন' বিষয়ে এক সপ্তাহের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

চ) উপজেলা রিসোর্স সেন্টারঃ

সরকাব শিক্ষকদের চাকুরীকালীন স্থানীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসেবে দেশব্যাপী প্রতিটি উপজেলা মডেল স্কুলের সাথে একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৯৫টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মান, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সরবরাহ ও কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষন প্রদানের পর কোন কোন উপজেলায় ইতিমধ্যে শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষন শুরু হয়েছে। আশা করা যায় অতি অল্প সময়ে সকল রিসোর্স সেন্টারে পূর্ন উদ্যমে কাজ শুরু হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই ইউআরসিগুলো স্থানীয় পর্যায়ে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষন, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

ছ) নিবিড় ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি, IDEAL ঃ

প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিবিড় ভাষা পদ্ধতি এবং নিবিড় জেলা কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ দুটি পদ্ধতি সারাদেশে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারলে একাধারে কোমলমতি শিশুর মনন ও মেধার বিকাশ যেমন হবে, তেমনি কর্মমূখী শিক্ষা গ্রহন ও নেতৃত্ব প্রদানের চেতনাও বিকশিত হবে।

❖ প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরনঃ

নারীর সমঅধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। তবুও আমাদের সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা এখনো শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহন করা হয়েছেঃ

ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৫০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে।

খ) মেয়ে ও পুরুষ শিশুর মধ্যে বৈষম্য দূরীকরনের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে

গ) পাঠ্যপুস্তকসমুহের অলংকরন ও বিন্যাসে মেয়ে ও পুরুষ শিশুর মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্যসূচক ধারনার স্থান দেয়া ।

ঘ) স্যাটেলাইট বিদ্যালয়গুলোতে ১০০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে।

ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে অধিক সংখ্যক মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগের নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চ) বিদ্যালয় আকর্ষনীয় কর্মসূচীতে মেয়ে শিশুদের অধিক হারে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ও ভৌত সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

ছ) প্রশিক্ষন কার্যক্রমে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এসব পদক্ষেপ গ্রহন করার ফলে উক্ত ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মেয়ে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ প্রাথমিক শিক্ষার কর্মপরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশে জনগণের প্রত্যাশানুযায়ী সাফল্য আসেনি সত্য কিন্তু সরকারের কর্মপ্রয়াস কখনো স্তিমিত হয়নি। নিরন্তর কর্মপ্রয়াসের ধারায় শিশু ভর্তির ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্রম প্রনয়নে, স্বাক্ষরতা বৃদ্ধিতে ও শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হয়েছে। সমাজের মধ্যে এখন শিক্ষার অর্ন্তগত চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কর্মপ্রয়াসের সহযোগী হিসেবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশসমূহ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত সাম্প্রসারিত করেছে। ১৯৯৭-২০০২ সালের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নকল্পে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। নুতন শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে বিশ্বসভায় বাংলাদেশ কখনই তার উপযুক্ত স্থান করে নিতে পারবে না। একটি স্বাধীন সার্বভৌম আত্মপ্রত্যয়ী জাতির প্রত্যাশা পূরনের লক্ষ্যে তাই সরকার ১৯৯৭-২০০২ সালের মধ্যে কাংখিত শিক্ষা স্তরে উপনীত হতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকরঃ

- বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৯৫ ভাগ ভর্তির হার নিশ্চিতকরণ।
- শতকরা ৭০ ভাগ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তিকরন।
- শ্রেণীকক্ষে কার্যকর পাঠদান পদ্ধতির প্রবর্তন, পাঠদান সময় বৃদ্ধিকরন।
- শিক্ষাক্রম ও শিক্ষোপকরণের পরিমার্জন ও উন্নয়ন সাধন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিখন-শেখানো উন্নয়ন সাধনের জন্য অব্যাহত তত্ত্বাবধান।
- প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যকর প্রায়োগিক পদ্ধতির উন্নয়ণ সাধন।
- বিদ্যালয় সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ।
- জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও গবেষনা কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার দক্ষতা অর্জন এবং সমষ্টিক পর্যায়ে সফল বাস্তবায়নের সামর্থ্য অর্জন।
- প্রয়োজনীযায়ী ভৌত সুবিধাদি প্রদান এবং নৈতিক জীবনাচরনের মানোন্নয়ন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষন কার্যক্রম জোরদারকরণ ও শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বর্তমানে বিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত শিখন কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্যঃ

- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ
- শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একই ধারার শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তন
- বেসরকারী সংস্থা সমূহকে প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ
- বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ধারার প্রবর্তন।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন উপরোক্ত লক্ষ্য ও পদক্ষেপ সমূহ ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারলে বলে আশা করা যায়।

মানব সমাজের সকল প্রকার ইতিবাচক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিকল্প আর কিছুই নেই। শিক্ষার জন্য বিনিয়োগই সবচেয়ে সফল ও সার্থক বিনিয়োগ হিসেবে আজও সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল পেতে আমাদের একটু বেশী সময় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়।। তাই সরকার সাধ্যের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সর্বাধিক বিনিয়োগ করতে কখনো কোনো কার্পণ্য করেনি। সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্মূল করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সময়ের মধ্যে সরকার বিদ্যালয় বিহীন প্রতিটি গ্রামের সকল শিশুর নাগালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অনেক অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অনেক অমসৃণ ও প্রতিকূল পথ পেরিয়ে এসেছে। সম্পদের অপ্রতুলতা আমাদের এ পথ চলার গতিকে কিছু ক্ষেত্রে শ্লথ করেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রের সাফল্যে আমরা উদ্দীপিত। আজ আমরা সাফল্যের ইশারায় অগ্রসরমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে যদি আমরা স্থির লক্ষ্য নির্ধারণ করে কর্মনিষ্ঠার সাথে সম্মুখপানে এগুতে পারি তবেই আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

৬. মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন ঃ

ঝিনাইদহ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শনের পূর্বে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারনা পেতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ EMIS শাখা, বিদ্যালয় শাখা পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে বর্তমানে বিদ্যালয় পরিদর্শনে ব্যবহৃত চেকলিষ্ট, উপজেলা, জেলা, পি টি আই পরিদর্শনে ব্যবহৃত চেক লিষ্ট, বিদ্যালয় ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পারফর্মেন্স প্রতিবেদন, বিদ্যালয় ভিত্তিক মাসিক রিটার্ন ছক, সাব-ক্লাষ্টার প্রশিক্ষন মনিটরিং ছক, ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করি এবং বিভিন্ন স্ত রের কর্মকর্তাগনের সংগে আলোচনা করে বিদ্যালয়েব কর্মকান্ড, উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকান্ড, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকান্ড এবং উল্লেখিত ছকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হই। অতঃপর উল্লেখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিদ্যালয় হতে তথা সংগ্রহের লক্ষ্যে ১টি চেকলিষ্ট তৈরি করি। সংযুক্তি বিদ্যালয় পরিদর্শন ছক। অতঃপর ঝিনাইদহ জেলা পরিদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহন করি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালের জুলাই মাসে ঝিনাইদহ জেলায় অবস্থান করে প্রথমে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করি ও কর্মকর্তাগনের সংগে মত বিনিময়ের মাধ্যমে পুনরায় ধারনা অর্জন করি ও তাদের অফিসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করি। অতঃপর সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের সংগে যৌথভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করি এবং তাঁদের পরিদর্শকল্পে গৃহীত ধাপগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করি যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে বিদ্যালয় পরিদর্শন একাকী সফলভাবে করতে সমর্থ হয়েছি।

যৌথ পরিদর্শন তথ্যঃ সদর উপজেলা

সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নাম	পরিদর্শনের তারিখ	বিদ্যালয়ের নাম
১। সাকী সালাম AUEO	০১/০৭/২০০০	১। হলিধানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২। বারি বাথান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৩। শহীদ মোশাররফ রেজিষ্ট্রেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়।
২। নীলা সালাম AUEO	০২/০৭/২০০০	১। কালী চরনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২। জুগনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৩। মান্দার বাড়ীয়া রেজিষ্ট্রেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৩। গোলাম মহিউদ্দিন ইউনিসেফ কনস্যালট্যান্ট আইডিয়াল প্রজেক্ট	০৩/০৭/২০০০	১। বার বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

যৌথ পরিদর্শনকালে আমি কোন তথ সংগ্রহ করিনি তবে কি ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তা পর্যবেক্ষন করি ও পরিদর্শনে কি ভাবে শিক্ষক/ SMC সদস্য সহায়তা করতে পারে এবং কি ধরনের প্রশ্ন তাদেরকে করা হয় তা অবহিত হই। অথ্যাৎ বিদ্যালয়ের সার্বিক তথ্য কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা অর্জন করি।

যৌথ পরিদর্শন ছাড়াও আমি নিজে নিম্নের স্কুল গুলো একাকী পরিদর্শন করি। নিম্নে আমার বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষন, মতামত ও তথ্য দেয়া হল।

জেলার নাম	DPEO অফিস	UEO অফিস	বিদ্যালয়ের নাম	পরিদর্শন কাল
ঝিনাইদহ	১	সদর	বিষয়খালী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ হরিখালী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	১-১৫ জুলাই, ২০০০
		কোট চাঁদপুর	কোর্ট চাঁদপুর মডেল- সোনালী রেজিঃ এলাঙ্গী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	
		মহেশপুর	গোর্দা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ জলিলপুর মডেল-	
		কালিগঞ্জ	বার বাজার সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ আদর্শ রেজিঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	
		হরিণাকুন্ড	রিশখালী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	
		শৈলকুপা	শেখপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ খালখোলা কমিউনিটি প্রাথঃ বিদ্যাঃ	

Dhaka University Institutional Repository

৬.১. ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিম্নের ৪ ধরনের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম মনিটরিং করে বিধায় ৪ ধরনের বিদ্যালয়ের তথ্য প্রদান করা হল।

উপজেলা	ইউনিয়ন	AUEO পদ	বিদ্যালয় সংখ্যা				শিক্ষক পদ সংখ্যা				ছাত্র-ছাত্রী			
			সরঃ	রেজিঃ	সংস্থা	কমিউ	সরঃ	রেজিঃ	সংস্থা	কমিউ	বালক	বালিকা	মোট	সাথে ছাত্রীর সংখ্যা
১। সদর	১৭	৬	৯৮	৮৮	২	৬	৪৭৪	৩৬২	৫	১৮	২৭০২৩	২৫৯২৮	৫২৯৫১	৩৩
২। কালিগঞ্জ	১১	৪	৬৬	৬৬	১৪	৬	২৯৪	২৬২	২৪	১১	১৬০৯২	১৭২১৭	৩৩৩০৯	২৯
৩। কোট চাঁদপুর	৫	২	৩৭	২৯	৮	৩	১৫১	১১৬	১৬	৮	৯০৮১	৮৭০৪	১৭৭৮৫	১৩
৪। মহেশপুর	১২	৪	৬৬	৬৮	১৮	১০	২৫৮	২৬৫	৩৪	২২	২২৭০৮	২৩০৩৮	৪৫৭৪৬	২৬
৫। শৈলকুপা	১৪	৬	৯০	৬৩	১৩	১১	৩৫৯	২৫১	২৫	৪২	২১৭৩২	২১৪৩৩	৪৩১৬৫	২৯
৬। হরিণাকুন্ড	৮	৩	৫১	৭৭	-	১	২১১	৩০০	-	৩	১২২৪৮	১২১৪৩	২৪৩৯১	২০
সর্বমোট	৬৭	২৫	৪০৮	২৭৪	৫৫	৩৭	১৭৪৭	১০৭৮	১০৪	১০৪	১০৮৮৮৪	১০৮৫৪৩	২১৭০৪৭	১৪২

- বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছাত্র -ছাত্রীর সংখ্যাঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সরকার স্বীকৃত বয়স হল ৬-১০ বছর। ৬-১০ বছর বয়সী শিশুর বাইরেও কম/বেশী বয়সের শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারী ও রেজিষ্টার্ড বেসরকারী বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ক্যাচম্যান্ট এলাকা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওয়ার্ড বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির মাধ্যমে উল্লেখিত বিদ্যালয়ের ক্যাচম্যান্ট এলাকা নির্ধারিন করা হয় এবং CPE কর্তৃক প্রতি দুই বছর পর পর শিশু জরীপ করা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ক্যাচম্যান্ট এলাকার শিশু জরীপ কাজ নির্ধারিত ছকে সম্পন্ন করে তথ্য নিজ বিদ্যালয়ে সংরক্ষন করেন ও পরবর্তী বছরে ঐ তথ্য হাল নাগাদ করেন। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের তথ্য একত্রীকরণ করে উপজেলার, প্রতিটি উপজেলার তথ্য একত্রীকরন করে জেলার মোট বিদ্যালয় গমনোপোযোগী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা নির্নয় করা হয়।

ঝিনাইদহ জেলার ৬-১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা = ২১৫১৮৬

বালিকা = ১০৭২৩৩

বালক = ১০৭৯৫৩

Dhaka University Institutional Repository

❑ **ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিঃ**

জেন্ডার	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	৫ম শ্রেণী	মোট	GER%
বালিকা	২৫০২১	২২২১৮	২০২৩৭	১৮০৪১	১৫২৪৫	১০০৭৬২	৯৪%
বালক	২৩৪৩২	২১৯৯০	১৯০৯২	১৭৬৩৪	১৫৮৬২	৯৭২১০	৯০%
মোট	৪৮৪৫৩	৪৩৪০৮	৩৯৩২৯	৩৫৬৩৪	৩১১০৭	১৯৭৯৭২	৯২%

উল্লেখিত ছকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,

- ১ম শ্রেণীতে বালিকার সংখ্যা বালকের চেয়ে ১৫৮৯ বেশী
- ২য় শ্রেণীতে বালিকার সংখ্যা বালকের চেয়ে ১১২৮ বেশী
- ৩য় শ্রেণীতে বালিকার সংখ্যা বালকের চেয়ে ১১৪৫ বেশী
- ৪র্থ শ্রেণীতে বালিকার সংখ্যা বালকের চেয়ে ৪০৭ বেশী
- ৫ম শ্রেণীতে বালিকার সংখ্যা বালকের চেয়ে ৬১৭ কম

মোট ভর্তিকৃত বালিকার সংখ্যা বালকের চেয়ে ৩৫৫২ বেশী এবং ৫ম শ্রেণী ব্যতীত সকল শ্রেণীতেই বালিকার সংখ্যাধিক্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তির হার GER আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যেখানে বালকের ভর্তির হার GER (GROSS Enrollment Rate) ৯০% তার বিপরীতে মেয়েদের ভর্তির হার GER ৯৪%।

জেলা, উপজেলা শিক্ষা অফিসে Net Enrollment Rate সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। আমার পরিদর্শিত ১২টি বিদ্যালয়ের তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে মোট NER ৮৩% তন্মধ্যে বালিকার ৮৫% এবং বালক ৮১ %।

আমার পরিদর্শিত বিদ্যালয়ের ভর্তির হার (NER) থেকেও প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা সত্যিই সন্তোষজনক ও আশাব্যঞ্জক। তথাপি শতকরা ১৫ ভাগ মেয়ে শিশু বর্তমানে কোন না কোন কারনে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। এই ১৫ ভাগ মেয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাই হল বর্তমানের চ্যালেঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

❑ ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতিঃ

ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি পর্যবেক্ষনের লক্ষ্যে ২০০০ সালের জুলাই মাসের ৩,৪,৭,৩১ ইং তারিখে নিম্নলিখিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করি। পরিদর্শন কালে শ্রেণী ভিত্তিক মাথা গুনে উপস্থিতি নির্ণয় করি। ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ঝিনাইদহ জেলার মধ্যে কোট চাঁদপুর উপজেলার অবস্থা সবচেয়ে ভাল এবং হরিনাকুন্ড উপজেলার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ।

উপজেলা	বিদ্যালয়	ভর্তিকৃত			উপস্থিতি		মোট		
		বালিকা	বালক	মোট	বালিকা		বালক	মোট উপস্থিতি	উপস্থিতির হার- বালিকা
১। সদর	১। বিষয়খালী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	২৪৭	২২৯	৪৭৬	২০৯	১৬৭	৩৭৬	৭৯%	৮৪%
	২। হরিখালী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	২২১	২১৬	৪৩৭	১৭৯	১৬১	৩৪০	৭৮%	৮১%
২। কোট চাঁদপুর	১। কোর্ট চাঁদপুর মডেল-	২৮২	২৮৭	৫৬৯	২৫০	২৬৭	৫১৭	৯১%	৮৯%
	২। সোনালী রেজিঃ	১৫৪	১৬৭	৩২১	১৪০	৭৫	২১৫	৬৭%	৯১%
	৩। এলাঙ্গী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	১৬৪	২১৩	৩৭৭	১০১	১৬৬	২৬৭	৭১%	৬১%
৩। মহেশপুর	১। গোর্দা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	২৮৬	৩০২	৫৮৮	২০৬	২৩৫	৪৪১	৭৫%	৯২%
	২। জলিলপুর মডেল-	১৯৮	২২৫	৪২৩	১২০	১৬৭	২৮৭	৬৮%	৬১%
৪। কালিগঞ্জ	১। বার বাজার সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	২০১	২১৫	৪১৬	১০৪	১৭১	২৭৫	৬৬%	৫২%
	২। আদর্শ রেজিঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	১৫০	১৩৭	২৮৭	৯৮	৩৯	১৩৭	৪৮%	৬৫%
৫। হরিনাকুন্ড	১। রিশখালী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	১২৫	১৫০	২৭৫	৭১	৮৫	১৫৬	৫৭%	৫৬%
৬। শৈলকুপা	১। শেখপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	২০৬	২৪১	৪৪৭	১৪৪	১৩৩	২৭৭	৬২%	৭০%
	২। খালখোলা কমিউনিটি প্রাথঃ বিদ্যাঃ	১০০	৮৭	১৮৭	৫৮	২০	৭৮	৪২%	৫৮%

উল্লেখিত ছকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জেলার গড় উপস্থিতি ৬৭%। সর্বোচ্চ উপস্থিতি ৯১% এবং সর্বনিম্ন উপস্থিতি ৪২%।

এখানে উল্লেখ্য যে, পরিদর্শিত ১২ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯টি 'A' ক্যাটাগরীর। তদুপরী উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়। তবে ৬টি বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি সন্তোষজনক এবং ছেলেদের তুলনায় বেশী। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে শহরের তুলনায় মেয়েদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম।

Dhaka University Institutional Repository

❑ **ঝরে পড়াঃ**

জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার মোট শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার ২৯%। আমার পরিদর্শিত ১২টি বিদ্যালয়ের মধ্য হতে ৪টি বিদ্যালয়ের (বিষয়খালী, খড়িখালী, এলাঙ্গী ও কোট চাঁদপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়) মোট ৩৬ জন ছাত্র ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের রেকর্ডে ঝরে পড়ার তালিকায় দেখতে পাই। এই ৩৬ জনের মধ্যে ২৩ জনই মেয়ে। আমি কোর্ট চাঁদপুর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আঃ খসরু, খড়িখালীর প্রধান শিক্ষিকা সাজেদা বেগম, বিষয়খালীর সহকারী শিক্ষিকা পাপিয়া বেগম এবং এলাঙ্গীর প্রধান শিক্ষক আঃ হালিমকে সংগে নিয়ে ২৮ জন ঝরে পড়া ছেলে মেয়ের বাড়ী পরিদর্শন করি এবং তাদের পিতা মাতা ও অভিভাবকের সংগে ঝরে পড়ার কারন জানার জন্য কথা বলি। ঝড়ে পড়ার কারন হিসেবে দেখা যায় যে, ২১ ভাগ মেয়ে গৃহ পরিচারিকার কাজে নিয়োজিত বিধায় স্কুল ত্যাগ করেছে এবং শতকরা ১৮ ভাগ মেয়ে বাল্য বিবাহের কারনে স্কুল ত্যাগ করেছে। নিম্নে স্কুল ত্যাগের অন্যান্য কারন এবং শতকরা হার দেখানো হলো- দরিদ্র- ২১%, প্রতিবন্ধী- ৪%, কৃষিকাজে নিয়োজিত- ১১%, বাসস্থান পরিবর্তন- ৭%, হকার- ৭% এবং অন্যান্য - ৩%।

❑ **বিদ্যালয় পরিবেশঃ**

পরিদর্শিত ১২টি বিদ্যালয়ে মধ্যে ১০টি বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন দেখতে পাই। যেমন- শ্রেণী কক্ষ ও বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ২ ইউনিটের পরিস্কার লেট্রিন, সচল টিউবওয়েল, বিদ্যালয়, আঙ্গিনায় ফুলের বাগান, বিদ্যালয় সীমানায় বৃক্ষরোপন, ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, শ্রেণীকক্ষ ও আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শুধুমাত্র মেয়েরাই ঝাড়ু দেয়া থেকে শুরু করে সব রকম কাজ করে থাকে। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এই কাজে শুধুমাত্র মেয়েদেরই উৎসাহ দিয়ে থাকে ছেলেদেরকে নয়।

❑ **মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাতঃ**

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদেরকে অধিক হারে ভর্তি ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ব্যাপারে মহিলা শিক্ষকগণ গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু ঝিনাইদহ জেলায় শুধুমাত্র সরকারী বিদ্যালয়ে কর্মরত মহিলা ও পুরুষ শিক্ষক অনুপাত বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ২৩% মহিলা শিক্ষিকার বিরপীতে ৭৭% -ই পুরুষ। নিম্নে ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপজেলার মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত প্রদান করা হলো–

নং	উপজেলা	শিক্ষক		হার		মন্তব্য
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
১.	সদর	৩৩৫	১২৯	৭২%	২৮%	সূত্রঃ বিদ্যালয় মাসিক রিটার্ন থেকে সংকলিত।
২.	মহেশপুর	১৯৩	৬৩	৭৫%	২৫%	
৩.	ঠশালকুনা	২৬৪	৮৭	৭৫%	২৫%	
৪.	কালীগঞ্জ	২৩৯	৫৪	৮২%	১৮%	
৫.	কোর্ট চাঁদপুর	১২৮	২৬	৮৩%	১৭%	
৬.	হরিনাকুন্ড	১৬৪	৪২	৮০%	২০%	
৭.	ছেলে মেয়ে	৭৩২৩	৪০১	৭৭%	২৩%	

Dhaka University Institutional Repository

❑ বিদ্যালয় প্রতি শিক্ষকঃ

ঝিনাইদহ জেলার মোট সরকারী বিদ্যালয় ৪০৮টি। বর্তমানে ৪০৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪ টিতে ২জন শিক্ষক। ১০৩ টি বিদ্যালয়ে ৩ জন করে শিক্ষক, ১৮৭ টি বিদ্যালয়ে ৪ জন করে শিক্ষক, ৬৪ টিতে ৫ জন শিক্ষক, ১৯ টিতে ৬ জন, ৫ টিতে ৭ জন, ৬ টিতে ৮ জন, ৫ টিতে ৯ জন, ৪ টিতে ১০ জন ও ১ টিতে ১১ জন শিক্ষক কর্মরত। অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষক সংখ্যা কম হওয়াতে মেয়ে ও ছেলে শিশু উভয়ের ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান ব্যহত হচ্ছে।

❑ শিক্ষক উপস্থিতিঃ

ঝিনাইদহ জেলার শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ে সময়মত উপস্থিতি সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করে রেজিষ্টার্ড বেসরকারী বিদ্যালয়ে। পরিদর্শিত ৩২টি বিদ্যালয় ছাড়াও রাস্তার পাশের অনেক বিদ্যালয়ে ঠিক সাড়ে নয়টায় বিদ্যালয়ে ক্লাশ শুরু হতে শুধু মাত্র ৩টি বিদ্যালয়ে দেখতে পাই এবং সাড়ে চারটার পূর্বেই তালাবদ্ধ অনেক স্কুল দেখতে পাই। বিশেষ করে ভাল যোগাযোগ এবং শহর অঞ্চল এলাকা ছাড়া বাকী বিদ্যালয় গুলি আমার মনে হয় সাড়ে চারটার পূর্বেই ছুটি হয়ে যায়।

❑ শিখন সামগ্রীঃ

বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত শিখন সামগ্রী দেখতে পাই।

১. শিক্ষক সংস্করন
২. শিক্ষক সহায়িকা
৩. প্রশ্ন পুস্তিকা
৪. আবশ্যিক শিখনক্রম
৫. ফ্লিপ চার্ট পরিবেশ পরিচিতি
৬. ফ্লিপ চার্ট ১ম শ্রেনী বাংলা
৭. ফ্লিপ চার্ট ২য় শ্রেনী গনিত
৮. নমুনা পাঠ পরিকল্পনা ১ সেট (১৭টি বই)
৯. বর্ণমালা প্রদর্শন বোর্ড
১০. অভিধান
১১. ম্যাপ,জেলা,উপজেলা,বাংলাদেশ ও পৃথিবীর
১২. গ্লোব
১৩. হাতে তৈরী শিক্ষাপ্যোকরন
১৪. বিভিন্ন চার্ট, যেমন- পাখি,পশু,মাছ,ফুল ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত দুঃখের সংঙ্গে বলতে হয় যে উল্লেখিত উপকরণ সমূহ হাতে গনা কয়েকজন শিক্ষক ব্যবহার করেন। অধিকাংশ শিক্ষকই কি ভাবে বই গুলি ব্যবহার করতে হয় বা বিদ্যালয়ে এইগুলি আছে কি না জানেন না। অথচ একজন শিক্ষক যদি শিক্ষক সংস্করন, শিক্ষক সহায়িকা বা আবশ্যিক শিখন ক্রম বই ব্যবহার করেন তা হলে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বা সকল শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করার জন্য অন্য কারো সহায়তার প্রয়োজন পড়বে না।

তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হল যোগ্যতা ভিত্তিক। এখানে ১টি শিশু প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি হয়ে ৫ম শ্রেনী পাশ করার পর ৫৩টি যোগ্যতা অর্জন করতে। শিক্ষক মন্ডলী এই ৫৩টি যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু এই ৫৩টি যোগ্যতার বিষয় ভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী যে উপযোগ্যতা সে সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারেন নাই।

যেমন-৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ২৮,২৯,৩০,৩১ ও ৩২ নং হল গনিত বিষয়ে। এই ৫টি আবার ৩৩টি এবং এই ৩৩টি আবার ২০৬টি উপযোগ্যতা হয়েছে। অর্থাৎ ২টি শিশু ১ম শ্রেনী থেকে ক্রমন্বেয়ে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত দৈনন্দিন পাঠের মাধ্যমে ২০৬টি যোগ্যতা অর্জন করবে। কোন যোগ্যতা আবার ১ম শ্রেনী থেকে শুরু হয়ে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত বিস্তৃত আবার কোন যোগ্যতা যেমন রোমান সংখ্যা ৪র্থ শ্রেনীতে শুরু এবং ৪র্থ শ্রেনীতেই শেষ। শিক্ষক দৈনন্দিন পাঠ শেষে এই যোগ্যতাগুলি শিশু অর্জন করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করবেন। কিন্তু কোন শিক্ষকই এই বিষয় সর্ম্পকে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন না অথচ এই গুলি সংযোজন করেই শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সংস্করন আবশ্যিক শিখনক্রম বই শিক্ষকদের সহায়তাদানের জন্য NCTB কর্তৃক রচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরন করা হয়েছে।

❑ খেলাধূলার সামগ্রীঃ

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমবেশী খেলাধূলার সামগ্রী যেমন-লুডু, স্কিপিং, ফুটবল, দাবা, ভলিবল, বাগাডুলী ইত্যাদি রয়েছে। তবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরাই বেশী খেলাধুলায় সুযোগ পায়। মেয়েদেরকে খেলাধুলার ব্যাপারে শিক্ষকগন তেমন উৎসাহিত করেন না। বরং বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ও শ্রেনীকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উৎসাহিত করেন। এমন কি মহিলা শিক্ষক ও অনুরূপ আচরন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

❑ **বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রঃ**

সরকারী বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র মোটামুটি চাহিদার বিপরীতে চলনসই পর্যায়ে আছে। পক্ষান্তরে রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারী কোন কোন বিদ্যালয়ে একেবারেই কোন আসবাবপত্র নেই। স্থানীয় লোকজন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় যে দু-চার জোড়া বেঞ্চ দিয়েছিলেন তাই ভগ্ন পায়ে শ্রেনী কক্ষে দাড়িয়ে আছে।

ঝিনাইদহ জেলায় আইডিয়াল প্রকল্পের আওতায় ১ম শ্রেনী ও ২য় শ্রেনীতে শিশুদের ম্যাটে বসানোর ফলে ৩য়-৫ম শ্রেনী পর্যন্ত বেঞ্চের ঘাটতি প্রায় দূর হয়েছে।

❑ **শ্রেনী কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার ব্যবস্থাঃ**

প্রতিটি শ্রেনীতেই ছেলে এবং মেয়েদের পৃথক ভাবে বসানো হয় এমনকি অনেক বিদ্যালয়ে যেখানে ১টি শ্রেনীতে বিভিন্ন সেশন আছে সেখানে ছেলেদের এক কক্ষে মেয়েদের অন্য কক্ষে বসানো হয়।

❑ **বিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্র সংরক্ষনঃ**

প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে বিভিন্ন রেজিষ্ট্রার ও ফাইলের মাধ্যমে সব রকমের তথ্য সংরক্ষন করা হয়। যেমন ক্যাশ রেজিষ্ট্রার, ষ্টক রেজিষ্ট্রার,শিক্ষাপোকরন রেজিষ্ট্রার, খেলাধুলার সামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদী রেজিষ্ট্রার ইত্যাদি।

❑ **ছাত্র শিক্ষক অনুপাতঃ**

মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত মানসম্মত হওয়া উচিত। ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ঃ শিক্ষক ৫৬ ঃ ১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঃ শিক্ষক ৫৮ ঃ ১।

❑ **ঝিনাইদহ জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শন সংক্রান্ত ঃ**

বাংলাদেশের প্রতিটি বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শনের বিধান আছে। যেমন- সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ১০টি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ৫টি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ৩টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা এবং উক্ত কর্মকর্তাগন পরিদর্শন করেও থাকেন। উল্লেখ্য যে, উনারা সর্বদাই যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল এমন এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়গুলো একাধিক বার পরিদর্শন করে থাকে পক্ষান্তরে দূর্গম এবং Remote এলাকার বিদ্যালয়ে বছরে ১ বার কি ২ বার

Dhaka University Institutional Repository

পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শিত বিদ্যালয় গুলির মধ্যে হরিনাকুন্ড উপজেলার ১টি বিদ্যালয় বিগত ১৮ মাসের মধ্যে ১ বারও যে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শিত হয়নি।

পরিদর্শন কালীন উল্লেখিত কর্মকর্তাগন নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং মাঝে মাঝে পরিদর্শন রেজিষ্ট্রারেও মন্তব্য লিখে থাকেন। তথ্য ছকে তথ্য সংগ্রহের পর ১টি কপি বিদ্যালয়ে সংরক্ষনের জন্য পরিদর্শক কর্তৃক বিদ্যালয়ে প্রেরন করে থাকেন। উল্লেখিত তথ্য ছক ও পরিদর্শন রেজিষ্ট্রার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উল্লেখিত পরিদর্শন বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কোন রকম ফলদায়ক নয়। যেমন-সরকারী ১টি বিদ্যালয় এই বছরে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক ৩বার ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক ৭ বার পরিদর্শিত হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তার পরিদর্শনে উল্লেখ করেন যে ২ জন শিক্ষককে বিনা অনুমতিতে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত দেখতে পাই। পর পর ৩ টি পরিদর্শনেই ২ জন শিক্ষককে অনুপস্থিত দেখতে পান কিন্তু তাদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। ২ জন শিক্ষকের মধ্যে আমিও ১ জনকে অনুপস্থিত দেখতে পাই। তা ছাড়া পরবর্তী পরিদর্শনে পূর্বের পরিদর্শনের পরামর্শ বাস্তবায়ন হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন বা যাচাই করা হয় না। গতানুগতিক মন্তব্য সম্বলিত পরিদর্শনই লক্ষ্য করা যায় যা একান্তই প্রশাসনিক দিককে জোর দেয়া। একাডেমীক সুপারভিশন বা ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন মোটেই করা হয় না। বিদ্যালয়ের পড়াশুনার গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য একাডেমিক সুপারভিশনের কোন বিকল্প নাই যার মধ্যে শ্রেনীকক্ষ পর্যবেক্ষন অন্তর্ভূক্ত। শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শ্রেনী পঠনে উপকরনের ব্যবহার। বিষয় বস্তুর উপস্থাপনে শিক্ষকের প্রস্তুতি, শিক্ষকের সীমাবদ্ধতা, পাঠের শিখন ফল কি? পাঠ শেষে শিখন ফল অর্জিত হয়েছে কিনা? মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়নের ধরন, শিশু কেন্দ্রীক শিখন কি না? অপারগ শিশুদের বেলায় কি নিরাময় মূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় ইত্যাদি বিষয়াদি থাকে অনুপস্থিত।

অতএব কার্যকর পরিদর্শন ব্যবস্থা দরকার যেখানে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা সরকারী নির্দেশে সারাদিন ১টি বিদ্যালয়ে থেকে শিক্ষকদের অসুবিধা বিহিত করবেন ও অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং যথাযথ সহায়তা প্রদান করবেন। প্রয়োজনে তিনি নিজে ঐ বিষয়টি শ্রেনীতে উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষকগন তাকে অনুসরন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২. ঝিনাইদহ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায় বা বাধাসমূহ ঃ

- শিক্ষক স্বল্পতাঃ ঝিনাইদহ জেলায় ৪০৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭৪৭ জন শিক্ষক পদের সংখ্যার, বিপরীতে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ১৫৮৬ জন। শুন্য পদের সংখ্যা ১৬১ জন। তাছাড়া শতকরা ৫৩% ভাগ বিদ্যালয়ে ৩ জন করে শিক্ষক রয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক স্বল্পতার কারনে শ্রেনী কক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

- বিদ্যালয়ে অবসর জনিত কারনে কোন পদ শুন্য হলে সেই পদ পূরন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় নেয়া হয়।

- এছাড়া সকল শিক্ষকই শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকতে চায়। বিশেষ করে মহিলা শিক্ষিকারা শহরের বাইরের বিদ্যালয়ের তুলনায় শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী থাকে। সব শিক্ষকই পছন্দ করেন বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়, দূরে কোথা ও যেতে চান না।

- যোগ্য শিক্ষকের অভাব। বিশেষ করে রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মান সন্তোষজনক নয়।
- ৪২% বিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষক পদ সংখ্যা মাত্র ৩ জন। যার পরিপ্রেক্ষিতে দৈনন্দিন শ্রেনী পঠন ব্যাহত হয়।
- গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক বেশি।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পোষ্টিং নিতে অনীহা। বিশেষ করে মহিলা শিক্ষিকারা শহর এলাকা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে যেতে চান না।
- শিক্ষকগন বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে পরিচালনা না করে বিভিন্ন অজুহাতে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসে ঘোরাঘুরি করেন।
- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিস হতে হয়রানির স্বীকার হওয়া। যেমন- EB Cross (Efficiency Bar Goss) নিয়োগকৃত কর্মকর্তা একজন শিক্ষকের EB Cross করেছেন মর্মে প্রত্যায়ন করেন। যার কোন সরকারী নীতিমালা নেই। একজন শিক্ষক হিসেবে তার যোগ্যতা EB Cross করেছে মর্মে প্রমানের কোন সুযোগ নেই। ঐ শিক্ষককে সম্পূর্ন রূপে নিয়োগ কর্তার উপর নির্ভর করতে হয়।
- শুন্যপদ পূরনের লক্ষ্যে বিদ্যালয় ভিত্তিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শুন্যপদ পূরন করা উচিত। তাছাড়া বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষমান তালিকা তৈরী করে পদশূন্য হওয়ার সাথে সাথে অপেক্ষামান তালিকা হতে নিয়োগ করা যেতে পারে।
- মহিলা শিক্ষিকার ৬০ ভাগ কোটা পূরনের লক্ষ্যে অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫জন শিক্ষকের পদের সংখ্যা সৃষ্টি করতে হবে।
- শহর এলাকার শিক্ষকদেরকে গ্রাম এলাকার বিদ্যালয়ে বদলী করে পদসংখ্যা সমন্বয় করা যেতে পারে। কোন কারনে সমন্বয় বদলী সম্ভব না হলে পৌর এলাকার বিদ্যালয়ের পদ ও শূন্য হলে ঐ শূন্য পদে নিয়োগ না দিয়ে ঐ পদটিকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে সমন্বয় করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- রেজিষ্ট্রার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার বিধান সম্বলিত পরিপত্র জারী ও শিক্ষক নিয়োগে সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া অনুসরন।
- বিদ্যালয়ে ভৌত সুবিধাদির মধ্যে বিদ্যালয়ের মেয়েদের জন্য আলাদা সচল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পৃথক লেট্রিন না থাকায় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসতে চায় না।
- AUEO, UEO, ADPEO, DPEO, ANO প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে এই সমস্ত পদগুলোতে অধিকাংশই পুরুষ। অতএব মেয়ে শিশুদের শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে উপরে উল্লেখিত পদ গুলোর বিপরীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলাদের নিয়োগ দান করা।
- শহরের স্কুল গুলিতে শিক্ষকদের উপস্থিতি কিছুটা সন্তোষজনক হলেও গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষক কৃষি এবং ব্যবসাসহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হয় না। এতে করে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে।
- জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে শিক্ষকদের বদলি করে তা কার্যকর করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বদলি করা হলেও তদ্বির ও চাপের মুখে তা বাতিল করতে হয়।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকই রাজনীতির সাথে জড়িত। যেটা সরকারী চাকুরীর নিয়ম-নীতির পরিপন্থি। নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের কোন অবস্থাপনার কারনে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে জবাবদিহিতা করতে হয়। কিন্তু রাজনীতি করার কারনে সে কোন কিছুর ব্যাপারে ভয় পায় না। ফলে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হলে সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কারনে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন না।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠিকমতো লেখা পড়া হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রতিটি স্কুলে ৯ বা ১১ সদস্যের স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (SMC) রয়েছে। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, দাতা সদস্য, অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বা ওয়ার্ড মাস্টার, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়ে SMC গঠিত হয়। অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে যে, অধিকাংশ স্কুলে কমিটির অস্তিত্ব খাতা পত্রে আছে, কিন্তু বাস্তবে এর কোন কার্যক্রমই নেই। যেমন হরিনাকুন্ড উপজেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে SMC কাগজে কলমে আছে, কিন্তু বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই।
- জেলার অনেক গ্রাম গুলোতে ব্র্যাক স্কুল হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী সরকারী বা রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হতে চায় না। এ ব্যাপারে তোজাম্মেল হক নামে এক অভিভাবক বললেন- মেয়েদের জন্য ব্র্যাক স্কুলই ভাল। কারন একেবারে গৃহস্থের উঠানে ব্র্যাক স্কুল খোলা হয় বা মেয়েদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।
- সবকারী স্কুল গুলিতে লেট্রিন জনিত সমস্যার কারনে চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে চায় না।
- কম বেতন, মর্যাদার অভাব ও অনুন্নত কর্ম পরিবেশ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের হতাশা ও ক্ষোভ। ফলে অনেক শিক্ষকই নানা উপপেশায় জড়িত।
- মেয়েদের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের সন্মুখীন হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা সর্বহারা ও চরমপন্থীদের আস্তানা বলে পরিচিত। আজ ৩ বছরেব শিশু থেকে নারীরা পর্যন্ত নিরাপদে নেই। হরিনাকুন্ড উপজেলাব একটি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ৯ বছরের এক ছাত্রী ধর্ষনের শিকার হয়েছে। ফলে সেখানকার অনেক অভিভাবকই তার কন্যার নিরাপত্তার কথা ভেবে বিদ্যালয়ে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩. সুপারিশ সমূহ ঃ

ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামগ্রীক তথ্য বিশ্লেষন করে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা গুলো রয়েছে সেগুলো দূরীকরনের উপায় সমূহ নিম্নে দেওয়া হল-

- মেয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদা ভিত্তিক বিদ্যালয় কর্মসূচী প্রনয়ন।
- শিক্ষক স্বল্পতা রোধকল্পে শহরাঞ্চলে যেসব বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন সেখান থেকে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী পোষ্টিং করে দেওয়া। এক্ষেত্রে কোন রকম চাপ বা তদবির যাতে না হয় সেই জন্য জেলা-উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
- শূণ্য পদ পূরনের জন্য দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহার করা দরকার। প্রয়োজনে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত। যাতে বিজ্ঞাপন, যাচাই, নিয়োগ প্রভৃতি প্রক্রিয়া শেষ হবার আগেই জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া যায়।
- জেলা শিক্ষিত, সচেতন, বেকার যুব সমাজকে শিক্ষকতা পেশা গ্রহন করার জন্য সচেতন ও আগ্রহী করার জন্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গ এবং কর্মকর্তাদের এব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন, মর্যাদা, বোনাস, বিভিন্ন ভাতা যাতে আকর্ষনীয় হয় শিক্ষা মন্ত্রনালয়কে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ।
- আবাসস্থলের কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যাতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
- শিক্ষকদের জেন্ডার বিষয়ে অবহিত করন ও সচেতন করে তোলার জন্য প্রশিক্ষন প্রদান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষনে জেন্ডার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান।
- মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয়ে যথাযথ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি।
- পাঠ্যক্রম, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষন-শিখন কার্যক্রম আকর্ষনীয় করনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তোলা।
- শিক্ষার বিষয়বস্তুতে জেন্ডার বিষয়টি যথাযথ সম্পৃক্ত করনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নারী পুরুষের বৈষম্যের বিভিন্ন দিক ও সেগুলো দূরীকরনের উপায় সম্পর্কে অবহিত করে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ করা যেতে পারে।
- শিক্ষকদের জবাবদিহিতায় ক্ষেত্রে এস, এম, সি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালনে আন্তরিক হতে হবে।
- বিদ্যালয় এবং শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নেব ক্ষেত্রে এলাকাবাসী, এস,এম,সি সদস্য, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক এবং অভিভাবক মহলকে সচেতন করে তোলা। এক্ষেত্রে DPEO, AUEO, ADPEO, ANO কর্মকর্তাদের কাজ করে যেতে হবে।
- বিদ্যালয়ে ভৌত সুবিধাদির মধ্যে মেয়েদের জন্য আলাদা সচল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পৃথক লেট্রিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- স্কুল ক্যাচম্যান্ট এরিয়ায় যে ম্যাপ দেওয়া থাকে সেখানে শুধু মাত্র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছেলে-মেয়েকে রঙ্গিন পিন এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু সেখানে ছেলে-মেয়ে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা হয় না। তাই ম্যাপে প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েকে আলাদা করে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।
- বিদ্যালয়ে সুপারভিশন এবং মনিটরিং পদ্ধতিতে জেন্ডার সমতা আনয়ন করা প্রয়োজন। যেসব ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন করা প্রয়োজন সেগুলো হলো- (১) উপস্থিতি (২) ক্লাশ রুম সংস্করন (৩) শ্রেণী কক্ষে বসার ব্যবস্থা (৪) শিক্ষকদের প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে (৫) শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহন ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষেত্রে (৬) পাঠচক্র সমাপ্ত করন।
- বিদ্যালয়ে সামগ্রীক পরিবেশ যাতে মেয়েদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- শিক্ষকদের এমন ভাবে প্রশিক্ষন দেওয়া প্রয়োজন যাতে করে তারা মেয়ে শিশুদের অধিকহারে বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিত করতে পারে সেজন্য অভিভাবক, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে জেন্ডার সমতা বিষয়ে বুঝাতে সক্ষম হয়।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনিক ইউনিট এবং সামাজিক সংস্থা গুলোকে মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা বিধানে অধিক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে ছেলে পাশাপাশি মেয়েদেরকেও সমান ভাবে অংশ গ্রহনে সুযোগ দিতে হবে। যেমন- খেলাধুলা, বাগান করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান প্রভৃতি।
- এস,এম,সিতে সদস্য হিসেবে অভিভাবকদের সংযুক্ত করা। বিশেষ করে মায়েদের এস,এম,সির মহিলার সদস্য হিসেবে কমিটিকে নিয়োগদান। যাতে করে তারা মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।
- এস,এম,সি কমিটি গুলোতে নারী পুরুষ সমতা আনয়ন করা প্রয়োজন। একটি কমিটিতে কমপক্ষে চার থেকে এগার জন সদস্য মহিলা হওয়া উচিত।
- দরিদ্র পরিবার গুলোর মেয়ে শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে আসতে পারে সে ব্যাপারে আরো অধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন।
- সর্বোপরি সবচাইতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সামাজিক আন্দোলনের। বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন, গণসংযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জারীগান ও নাটকের আয়োজন করে গনসচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। যেমন- মিনা কার্টুন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

সমাজের সুষম উন্নয়নে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু উভয়েরই শিক্ষা দরকার। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত নানামূখী কর্মসূচী গ্রহনের ফলে বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রী ভর্তির অনুপাত বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম সোপান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫, ১৯৯৬ সালে এটি ছিল ৫২ঃ৪৮। বর্তমানে এটি ৫১ঃ৪৯ এ উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত মহিলা শিক্ষকের অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে শিক্ষক শিক্ষিকার অনুপাত ছিল ৭৯ঃ২১ বর্তমানে এটি ৬২ঃ৩৮ এ উন্নীত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা নিয়োগ সরকারের একটি বিঘোষিত নীতি। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের উপস্থিতি বালিকা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। তাই নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষায় জেন্ডার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয়কে শুধু ছেলে বান্ধব নয়, মেয়ে বান্ধব ও করতে হবে। যদি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তাহলে তাদের প্রভাবে সমাজের সাধারন মানুষও প্রভাবিত হয়ে মেয়েদের শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষন, মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন এবং বিভিন্ন তথ্যের আলোকে গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন অতীতের তুলনায় বর্তমানের সাফল্য খুবই ইতিবাচক। যেখানে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় ২০০০ সাল নাগাদ জাতীয় লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে ছিল ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু ভর্তির হার ৯৫% এ উন্নীত করন এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৭০% এ উন্নীতকরন, সেখানে সরকারের নিজস্ব তহবিল ও বৈদেশিক অর্থ-সহায়তায় বাংলাদেশ শুধুমাত্র এ লক্ষ্য মাত্রা অর্জনই করেনি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এ লক্ষ্য মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে স্থুল ভর্তির হার ৯৭% ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে ৬-১০ বছর বয়সের মেয়ে শিশুদের ভর্তির হার ৯৭.৭%। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জনগনের সচেতনতা এবং যুগান্তকারী কিছু কর্মসূচী গ্রহনের ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। তবে মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিশুদের ঝরে পড়ার হার এখনও উদ্বেগ জনক। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ প্রবনতা বেশী। বাল্য বিবাহ, দারিদ্রতা, গৃহপরিচারিকার কাজে শহরে আগমন ইত্যাদি কারনে মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার এখনও কমেনি। তবে আশা করা যায় মেয়েদের উপবৃত্তি এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করার কাবনে হয়তো এই প্রবনতা অনেক হ্রাস পাবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকেও তাই সামাজিক আন্দোলনের আওতায় আনতে সমর্থ হলে সামাজিক জীবনে এর সুফল অবশ্যম্ভাবী।

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিবাচক দিকটির কথা স্মরন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ন রূপে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক- অভিভাবিকাদের অনুকূলে আনতে হবে যাতে সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের কোন প্রশ্ন না উঠে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, ব্যয় বরাদ্দ এবং সাম্য এনে কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবনতা প্রতিরোধ করার জন্যে বিদ্যালয় ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। সে সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা বৃদ্ধি, আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন শিক্ষাদানের প্রয়াস সৃষ্টি করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সকল প্রতিশ্রুতির বিষয়ে বাংলাদেশ অধিকতর সচেতন। ২০১৫ সাল নাগাদ সবার জন্য গুনগত মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০০ এর ডাকার ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রনয়ন করা হচ্ছে নতুন জাতীয় কর্মপরিকল্পনার। অতীতের অর্জিত সাফল্যকে সুসংহত করা এবং নব নব ধ্যান ধারনার সমন্বয়ে এই শতকের উপযোগী, কার্যকরি, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও শিশুকেন্দ্রিক একটি মানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন এর মূল লক্ষ্য। এরই পাশাপাশি ২০০৩-২০০৮ সালের জন্য সরকার প্রণয়ন করছে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (২য় পর্যায়)। এ কর্মসূচীতে, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হ্রাস, শিক্ষক-ছাত্র সুবিধার সম্প্রসারণ, সর্বস্তরে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন, এসআইএস এর উন্নয়ন শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি, অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগী সমাজের শিশুদের জন্য অব্যাহত আর্থিক সহায়তা কর্মসূচী, বিনামূল্যে পুস্তক, শেখন-শিক্ষন উপকরণ সরবরাহ, বিদ্যালয় ফিডিং কর্মসূচীর সম্প্রসারণ, অর্থবহ সামজ সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো দক্ষ ও সক্রিয় করা, বিদ্যালয় পর্যায়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রম বিষয়ক পুস্তক সরবরাহ, পিটিআই, নেপ ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলোর প্রশিক্ষন প্রদান সুযোগ সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ, পরিদর্শন ও সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার এবং বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আশা করা যায়, যদি এসব কার্যক্রম গ্রহন এবং এর সফল বাস্তবায়ন করা যায় ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নবতর অধ্যায়ের সংযোজন ঘটবে। সর্বোপরি মেয়ে শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে সামাজিক আন্দোলনের "সকল শিশুর জন্য মান সম্মত শিক্ষা" বিশ্বের এই অঙ্গীকার ও আশার বানীকে বাস্তবায়িত করতে হলে একটি সম্প্রসারিত দৃষ্টি ও গভীরতর অনুপ্রেরনা চাই অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রের। মেয়ে শিশুদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্মীয় কুসংস্কার, আর্থিক সংকট, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সহ সকল সীমাবদ্ধতা তখন অতিক্রম করা সম্ভব-- সংকল্পের দৃঢ়তায়, সৃজনশীলতার নতুনত্বে, প্রেরনার উদ্ভাসে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	:	Annual Development Programme
AUEO	:	Assistant Upazillah Education Officer
BANBEIS	:	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics.
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
CPEIMU	:	Compulsory Primary Education Implementation Monitoring Unit
CPE	:	Compulsory Primary Education
DPE	:	Directorate of Primary Education
DG	:	Director General
DPEO	:	District Primary Education Office
GOB	:	Government of Bangladesh
GDP	:	Gross Domestic Product
GER	:	Gross Enrollment Rate
MWCA	:	Ministryof Women & Children Affairs
NFE	:	Nor Formal Education
NGO	:	Non Governmental Organization
NER	:	Net Enrollment Rate
NAP	:	National Action Plan
PMED	:	Primary and Mass Education Division
SMC	:	School Managing Committe
UNDP	:	United Nations Development Program
UEO	:	Upazilla Education Office

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আকবর শ্যামলী, আখতার সৈয়দা তাহমিনা, বেগম জাহান আরা- নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, প্রকাশক- মোহাম্মদ লিয়াকত উল্লাহ, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ ৯ বাংলাবাজার, আশ্বিন ১৪০৫, ঢাকা।

২. খাতুন খাদিজা, লতিফা আকন্দ, হক জাহানারা, হোসেন শওকতআরা, নাঈম ফায়জানা (সম্পাদনা)- নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, প্রকাশনায়- উইমেন ফর উইমেন ঃ গবেষনা ও পাঠচক্র, মার্চ-১৯৯৫।

৩. আজীজ আবদুল (সম্পাদক) ও অন্যান্য সদস্য- শিশু অধিকার, বাংলাদেশ খেলাঘর, প্রকাশনা- কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর ২৯৯ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। প্রকাশকাল- মার্চ- ১৯৯২।

৪. অগ্রযাত্রা- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারী- ১৯৯৫, সহযোগিতায়-ইউনিসেফ, ঢাকা।

৫. ব্র্যাক, বাংলাদেশ, নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন রিপোর্ট-১৯৯৩।

৬. ইসলাম মেহেরুন নেছা, নারী শিক্ষা ঐতিহাসিক ধারায় নারী সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বেগম রোকেয়া ও নারী জাগরন, ফরিদা প্রধান সম্পাদিত, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদালয়, ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৭. ইসলাম মোঃ নূরুল, মনজুর মোঃ- বাংলাদেশ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, মুক্তসংখ্যা-৬২-৬৩, অক্টোবর'৯৮- ফেব্রুয়ারী-১৯৯৯।

৮. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০০১, মড্যুল, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৫-১০ জানুয়ারী-২০০২, ২২-২৭ পৌষ-১৪০৮।

৯. হোসেন মনিরা- শিক্ষা গবেষনা, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, EDM-1205, প্রকাশনা- পাবলিশিং প্রিন্টিং এবং ডিষ্টিবিউশন বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর-১৯৯৯।

১০. চৌধুরী জোৎস্না বিকাশ, ইনাম মুহাম্মদ ইবনে, 'শিক্ষার ইতিহাস', ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া (সম্পাদনা) স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর-১৯৮৬।

১১. ওহাব এম এ, সরকার আবদুল গণি, হোসেন মনিরা, বাংলাদেশের শিক্ষা, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশনায়- প্রিন্টিং, ডিষ্ট্রিবিউশন বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়, গাজিপুর-১৭০৪, প্রথম প্রকাশ- মার্চ-১৯৯৯।

১২. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়, ইউনিসেফ জাতিসংঘ শিশু তহবিল, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, মুদ্রনে অর্কিড প্রিন্টার্স।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. খান লুৎফর রহমান, মহিউদ্দিন এম এ এইচ, প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা- প্রফেসর মু. রিয়াজুল ইসলাম (সম্পাদনায়) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। মুদ্রনে- রূপালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ ৭৫, দক্ষিন বাসাবো, ঢাকা-১২১৪, মুদ্রনকালঃ এপ্রিল-২০০২।

১৪. প্রগতির পথে-২০০০, সম্পাদনায়- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় এবং ইউনিসেফ।

১৫. হক মোঃ আনোয়ারুল- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশন, প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০০১ উপলক্ষ্যে জাতীয় সেমিনার।

১৬. মেয়ে শিশু ও শিক্ষা- আশা, ইউনিসেফ, পান্ডুলিপি প্রনয়ন, কাজ কেন্দ্র, ঢাকা।

১৭. Primary Education statistics In Bangladesh-2001, Directorate of Primary Education, Primary & Mass Education Division.

১৮. Ara Afroze Jahan Quazi- Situation Analysis of Primary Education In Bangladesh from Gender Perspective, Institute of Education & Research, University of Dhaka.

১৯. Bangladesh Country Paper- Primary & Mass Education Division, Government of the People's Republic of Bangladesh.

২০. Hossain Mosharraf, Yousuf Anisatul Fatema- Future of Girl's Education in Bangladesh. Academy for Planning and Developmnet, Sonargaon Road, Nilkhet, Dhaka-1205, March-2001.

২১. Naripokkho- Gender Audit Preparation on Intensive District Approach to Education for All (IDEAL) Project, National Curriculum and Text Book Board, IDEAL Project and UNICEF (Conducted), February- 1999.

২২. দৈনিক দিনকাল, ৯ই আশ্বিন-১৪০৯ বাংলা, ২৪শে সেপ্টেম্বর-২০০২।

২৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ বৈশাখ-১৪০৭ বাংলা, ১৩ই মে-২০০০।

২৪. The Daily Star, October 29, 2002.